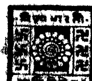
নক্ষত্র-পরিচয়

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

১০



বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগ-শিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

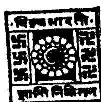
এই অভাবপূরণের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। ১ বৈশাখ ১৩৫০ হইতে প্রতিমাসে অন্যূন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য আকারভেদে ছয় আনা ও আট আনা।

। প্রকাশিত হইয়াছে।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

নক্ষত্র-পরিচয়

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

১ অগ্রহায়ণ ১৩৫০

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা
১১'০—১৭. ১১. ৪৩

গ্রন্থকারের নিবেদন

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেওয়ার পর, শিক্ষার্থীদের নিকট মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের তথ্য সহজ ও সরল ভাষায় বলবার আদেশ দিয়েছিলেন গুরুদেব। তিনি বলতেন, "বিজ্ঞানের সেচন ব্যাপারকে যথেষ্ট ব্যাপক করে তোলো; আমাদের দেশ যেখানে বিজ্ঞানের পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত সেখানে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে পড়ুক, দেখবে তাতে তার চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকবে।"

তাঁরই আদেশ শিরোধার্য করে আমি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে-সব তথ্য এখানকার ছেলেমেয়েদের কাছে মাঝে মাঝে উপস্থিত করেছি, এই রচনার অধিকাংশই তার থেকে নেওয়া।

এই বই লেখার কাজে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ এম. এ. ও রসায়নবিদ্যার ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় এম. এসসি. মহাশয় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁরা যত্ন করে এই রচনার সমস্তটা পড়েছেন ও পড়ে খুশি হয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় এই বইয়ের অনেক ত্রুটি সংশোধন করেছেন। তাঁদের কাছে এই সাহায্য ও অনেক সময়োচিত উপদেশ পেয়ে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেন

শ্রীযুক্ত তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

এই বইখানি আপনাদের নামের সঙ্গে যুক্ত করছি।

শান্তিনিকেতন

১ আগস্ট, ১৯৪৩

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

রাত্রির আকাশ

দিনের বেলা সূর্যের আলোর একটা গাঢ় আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে থাকে, এর বাইরে আর যে কিছু আছে তা আমাদের দেখতেই দেয় না। দিনের শেষে এই আলোর আচ্ছাদন সরে যায়, তখন অন্ধকার ছেয়ে প্রকাশ পায় নক্ষত্রলোক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর বিন্দুর আকারে। প্রকাণ্ড হলঘরের গোলাকার ছাদে ঝুলানো আলোগুলিকে যেমন দেখায়, আমাদের মাথার উপরে আকাশগোলকে এই নক্ষত্রগুলিকেও তেমনি ঝুলানো আলোর মতোই মনে হয়। মেঘমুক্ত অন্ধকার রাত্রিতে দেখা যাবে হাজার হাজার নক্ষত্র আকাশ ছেয়ে আছে; একটু লক্ষ্য করে দেখলেই এদের মধ্যে উজ্জ্বলতা ও রঙের ভেদ সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে, কেউ বা উজ্জ্বল, কেউ বা ম্লান, কেউ বা লাল, কেউ বা হল্‌দে, কেউ বা নীল আবার কেউ বা সাদা। প্রথম দৃষ্টিতে এই ধারণা জন্মায় যে আকাশে নক্ষত্রের দল যেন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, কিন্তু একটু ভালো করে দেখলেই বোঝা যায় এদের মধ্যে এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের অবস্থানের ভিতর বিশেষ শৃঙ্খলা বর্তমান। কোথাও বা কতকগুলি নক্ষত্র এমনভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে যে মনে হয় একগাছা আলোর মালা যেন আকাশের গায়ে নিপুণভাবে সাজানো, কোথাও বা একদল ম্লান নক্ষত্র ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে এক মধুচক্র রচনা করেছে, আবার কোথাও বা এদের বিন্যাসে সিংহ, ভল্লুক, মেষ, বৃষ, কুকুর, বৃশ্চিক প্রভৃতি জীবজন্তুর আকৃতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বহুদিন আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা নক্ষত্রদলের অবস্থানের মধ্যে এসব শৃঙ্খলা লক্ষ্য করে পরিচিত পদার্থ ও প্রাণীর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য কল্পনা করেছিলেন; অতীত যুগের সেই দল-

বাঁধা অবস্থার রূপ হাজার হাজার বছরেও বিশেষ বদলায়নি, তাই আজও আমরা নক্ষত্রদলের মধ্যে এই কল্পিত আকৃতির খোঁজ করে সহজেই আকাশে তাদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারি।

ভূপৃষ্ঠকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের যেমন আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে তেমনি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গোটা আকাশ-টাকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের এক-একটা নাম দিয়েছেন। পৃথিবীর এক-একটা ছোটো অংশকে যেমন দেশ, সাগর এসব বলা হয়, তেমনি আকাশের প্রত্যেক কল্পিত ভাগে যে-সব নক্ষত্র রয়েছে তাদের সমষ্টিকে বলা হয় নক্ষত্রমণ্ডল (Constellation)। দেশ, মহাদেশ, সাগর, মহাসাগরের ন্যায় প্রত্যেক নক্ষত্রমণ্ডলের এক-একটা নির্দিষ্ট আকৃতি আছে। ভারতবর্ষ বলতে যেমন, পৃথিবীর উপর নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত, বিশেষ আকৃতির স্থলভাগ নির্দেশ করে, তেমনি কোনো বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডল বলতেও আকাশের একটি নির্দিষ্ট অংশের ছোটো বড়ো নক্ষত্র মিলে যে বিশেষ আকৃতির ধারণা জন্মায় তাকেই বোঝায়। এদের নামও অনেক ক্ষেত্রে এই কল্পিত আকৃতি অনুসারে দেওয়া হয়েছে। পরিচিত প্রাণী ও পদার্থের সঙ্গে আকৃতির সাদৃশ্য দেখে কোনো কোনো নক্ষত্রমণ্ডলের বহুযুগ পূর্বে যে-নাম দেওয়া হয়েছিল তাদের সেই নাম আজও রয়ে গেছে, কিন্তু অধিকাংশের নামই গ্রীকপুরাণে বর্ণিত বীর ও পদার্থের নামের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় ১৮০০ বছর পূর্বে গ্রীক দার্শনিক টলেমি (Ptolemy) আকাশের নক্ষত্রগুলিকে ৪৮টি নক্ষত্রমণ্ডলে ভাগ করে এভাবেই তাদের নামকরণ করেন। নক্ষত্র-মানচিত্রে ও কৃত্রিম আকাশ-গোলকে যে-সব অদ্ভুত মূর্তি সন্নিবিষ্ট থাকে তাতে টলেমির নাম-দেওয়া নক্ষত্রমণ্ডল ছাড়া আরও ২০টি নাম যোগ করেছেন পরবর্তী যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। অনেক আধুনিক নক্ষত্র-মানচিত্রে এই অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্তিগুলিকে বাদ

দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের নামগুলি যথাস্থানে রাখা হয়েছে। আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলিকে চিনে রাখতে পারলে নক্ষত্রমণ্ডলগুলি চেনা সহজ হয়, কিন্তু একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, সিংহমণ্ডলের নক্ষত্রগুলিকে ঠিক সিংহের আকৃতিতে ও বৃষমণ্ডলের নক্ষত্রগুলিকে ঠিক বৃষের মূর্তিতে সাজানো দেখা যাবে। আকাশে মেঘ দেখে, দূরে পাহাড়ের সীমারেখা দেখে ও সূর্যাস্তে আবছা অন্ধকারে দূরের গাছপালা দেখে যেমন অনেক সময় আমরা নানা জীবজন্তু ও পদার্থের আকৃতি কল্পনা করে থাকি, তেমনি আকাশের নক্ষত্রগুলিকে দেখে এক-একটা বিশেষ আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে যেরূপ নির্দিষ্ট সীমারেখার প্রয়োজন, তেমনি যে-রেখাগুলি দিয়ে নক্ষত্রমণ্ডলী সীমাবদ্ধ, আকাশের বিভিন্ন অংশের সীমানা নির্দেশ করতে সেগুলিও বিশেষ উপযোগী। এই রেখা দিয়ে বিভক্ত আকাশপট জ্যোতির্বিজ্ঞানীর এত সুপরিচিত যে এর কোথাও কোনো আকস্মিক ঘটনার উদ্ভব হ'লে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিতে পারেন কোন্ নক্ষত্রমণ্ডলে তা ঘটেছে।

———

দুরবীনদৃষ্টি ও নক্ষত্রলোক

আদিম যুগে যখন বোধের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির যোগ ঘনিষ্ঠ হয়নি তখন তার সহজবোধশক্তির ভিতর দিয়ে সে যা-কিছু দেখত তাকেই সত্য বলে মেনে নিতে দ্বিধা করত না। সহজ ভাবেই সে ভেবেছিল বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে তারই বিশেষ সুখসুবিধার জন্যে; সূর্য, চন্দ্র ও জ্যোতিষ্কের দল দিনে-রাত্রে তারই পরিচর্যায় নিযুক্ত। যে-পৃথিবীকে আশ্রয় করে সে বেঁচে আছে তাকেই সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্র বলে নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছিল, কারণ তার সহজদৃষ্টিতে সে দেখেছিল বিশ্বের মাঝখানে পৃথিবীর আসন স্থির, আর সেই পৃথিবীকেই পরিবেষ্টন করে আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, পুব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবী যে স্থির নয় ও তার গতি থেকেই যে নক্ষত্রদের চলা সম্বন্ধে এই বিভ্রম জন্মাচ্ছে একথা সে বুঝতেই পারেনি। দুহাজার বছরেরও বেশী হ'ল পিথাগোরস (Pythagoras) ও ফিলোলাস (Philolaus) প্রচার করেন যে পৃথিবী স্থির হয়ে নেই, এক মেরুদণ্ডের চারদিকে ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে, তারই ফলে দিনরাত্রির সৃষ্টি। খ্রীস্টজন্মের ৩০০ বছর পূর্বে বিখ্যাত গ্রীক গণিতবিদ্ আরিস্টারকস (Aristarchus) আবিষ্কার করেছিলেন যে পৃথিবীর এই আহ্নিকগতি ছাড়া আরও একটা গতি আছে যার প্রভাবে পৃথিবী এক বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, আর এই গতির ফলেই ঋতুপরিবর্তন হয়। কিন্তু এসব মতবাদ বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি, কারণ বিখ্যাত দার্শনিক আরিস্টটল (Aristotle) এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন যে এই বিশ্বে পৃথিবীর আসন অবিচলিত। খ্রীস্টপরবর্তী প্রথম ও মধ্যযুগে ধর্মযাজকদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম; তাঁরা আরিস্টটলের মত সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন,

জনসাধারণও সেই ভুল মত মেনে নিতে বাধ্য হ'ল, কারণ খ্রীস্টধর্মের প্রতিনিধিদের অনুমোদিত কোনো মতের বিরোধিতা করার শাস্তি ছিল তখন প্রাণদণ্ড।

এই ভুল মতবাদ প্রায় ১৫০০ বছর ধরে জ্ঞানালোকের পথ রুদ্ধ করে চলেছিল, কিন্তু ১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে পোল্যাণ্ডের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকস (Nicolaus Copernicus) একখানি বই (De Revolutionibus Orbium Coelestium) লিখে এই মতবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে কঠোর সমালোচনা করতে সাহসী হন। ধর্মযাজকদের হাতে পিথাগোরস ও আরিস্টারকস-এর মতের ন্যায়ই কোপার্নিকস-এর মতবাদেরও হয়তো সমাধি ঘটত, কিন্তু ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে গ্যালিলিও (Galileo) দুরবীন তৈরি করে সর্বপ্রথম কয়েকটি গ্রহের পরীক্ষা থেকে হিসাব করে প্রমাণ করলেন যে এরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। তাঁর পরবর্তী পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ হ'ল যে এই বিশ্বের অগণিত জ্যোতিষ্কের মধ্যে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র গ্রহ, অন্যান্য গ্রহের ন্যায় আপন মেরুদণ্ডে আবর্তিত হতে হতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। আরিস্টটল, টলেমি ও আরও অনেক বিখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তির কল্পনাকে আশ্রয় করে যে-মতবাদ ২০০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, গ্যালিলিওর পরীক্ষা তার মূলে আঘাত করল, তাই তাকে বিদায় নিতে হ'ল গ্রহণযোগ্য মতবাদের পর্যায় থেকে। যে-অভিমানের বশে মানুষ নিজেকে একদিন বিশ্বের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, নির্মম সত্যের আঘাতে তার সেই অভিমানের পরিসমাপ্তি হ'ল, সে তার নির্দিষ্ট আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। ছায়াপথ (Milky Way) নামে আকাশগোলকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত যে-নিরবচ্ছিন্ন আলোকপথ রয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর দেশে দেশে স্বর্গলোকের কত কাহিনী

রচিত হয়েছে, গ্যালিলিওর দুরবীনদৃষ্টিতে মুহূর্তেই সেই কাহিনীর অবসান ঘটল ; জানা গেল, আমাদের দৃষ্টিশক্তিতে যাকে আলোকপথ বলে মনে হয় তার ভিতর রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্রের দল, সীমাহীন শূন্যে কল্পনাতীত দূরত্বমাত্রা নিয়ে এদের অবস্থিতি। বিরাট দূরত্ব এদের আলোকে করেছে ম্লান, সন্নিবেশকে করেছে নিবিড়, তাই এদের আলাদা অস্তিত্বের খবর আমাদের অনুভূতিতে এসে পৌঁছয় না, একটা নিরবচ্ছিন্ন আলোকপথ বলেই বিভ্রম জন্মায়। বিশ্বের কী যে প্রকাণ্ড চেহারা তা এই সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানী-ঋষির পরীক্ষায় প্রথম ধরা পড়ল।

এই দুরবীনের যুগ আসার পরেই মানুষ দুরবীনের শক্তি বাড়িয়ে চলল, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল মহাশূন্যে তার দৃষ্টির সীমানা ; আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠল বিশ্বের রূপ। বিশ্বসৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে একটা জিনিস সবচেয়ে বড়ো হয়ে চোখে পড়ল, বিশ্বপ্রকৃতি তার চেহারাটাকে এমন নিপুণভাবে সাজিয়ে রেখেছে যাতে মানুষ তার সহজ বোধশক্তির কাঠামোর মধ্যে তাকে ধরতে পারে ; অতিবড়োকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাকে করেছে ছোটো, আর অতিছোটোকে করেছে অদৃশ্য। কিন্তু সহজশক্তির সীমানা ছাড়াতেই মানুষ তার সমস্ত বুদ্ধিকে রেখেছে জাগ্রত, সেই কঠিন সাধনায় সে দূরকে করেছে নিকট, দুর্জ্ঞেয়কে করেছে সহজবোধ্য, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়বোধের নির্দিষ্ট সীমা ও তার বিশেষ প্রকৃতি দিয়ে দেখা এই অনুভূতির জগতের অস্পষ্ট পরিচয়ে, এই আভাস ও ইশারায় সে সন্তুষ্ট হ'ল না ; এই অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে তাই চলল তার অভিযান। এই বিশ্ব যতই প্রকাণ্ড বড়ো ততই প্রকাণ্ড ছোটো করে আমাদের চোখের সামনে ধরা হয়েছে, সমগ্রটাকে এক করে দেখা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব বলেই। যে-সূর্য প্রায় তেরো লক্ষ পৃথিবীর মতো বড়ো, ন'কোটি মাইলেরও বেশী

দূরে আছে বলে আকাশে তাকে দেখায় ছোটো একখানি থালার মতো; সমস্ত সূর্য যদি আমাদের খুব কাছে থাকত তাহলে তার সমগ্র রূপ যে কী তা আমরা জানতেই পারতাম না। আমাদের তুলনায় যা অতি-বৃহৎ তাকে আমরা যতটুকু জানতে পারি সে দূরের থেকে। সূর্য ছাড়া আকাশের আর-সব তারাগুলিকে আমরা দেখি আলোর বিন্দুর মতো, অথচ এদের বেশীর ভাগই সূর্যের চেয়ে অনেক বড়ো। এর থেকেই বোঝা যায় কী অচিন্তনীয় দূরত্বের মধ্যে এই নক্ষত্রপুঞ্জ ছড়ানো আছে। আকাশের যে-গোলকার্ধ পৃথিবীর দিক্‌সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ সেইটুকুর মধ্যেই এমন বিরাট দূরত্ব সংহত হয়েছে বলেই নক্ষত্রলোকের ছবি আমরা দেখতে পাই।

যে অসীম দূরত্বের মধ্যে নক্ষত্রের দল ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগ চোখের দেখা দিয়ে; এদের যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কারণ আকাশ পার হয়ে ওখান থেকে আলো এসে পড়ছে আমাদের চোখে। দূরে কোথাও যদি আলো জ্বলে ওঠে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তা দেখতে পাই; সেখান থেকে আলোটা চলে এসে আমাদের চোখে আঘাত করে, তাই আলো জ্বালা জানতে পারি। তাহলে দেখা যাচ্ছে আলো চলে; এই চলা বলতে সামান্য চলা নয়, এমন চলা জগতের আর-কোনো পদার্থের নেই। এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পার হয়ে যায় এত দ্রুত তার গতি। আমরা ছোটো পৃথিবীর মানুষ, আলোর এই প্রচণ্ড গতি শুধু অনুভবে বুঝব এত বড়ো জায়গা এখানে পাব কোথায়! তাই আলোর চলার কথাটা জানবার সুযোগই হয় না; সেই সুযোগ ঘটে মহাশূন্যের বিরাট দূরত্বের মধ্যে। এই নক্ষত্রলোকে সূর্যই আমাদের নিকটতম আত্মীয়, তবু পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব কম নয়, ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। এই রাস্তা পেরিয়ে

তার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় প্রায় আট মিনিটে। কিন্তু নক্ষত্রলোকের দূরত্বের মাপকাঠিতে পৃথিবী-স্থর্যের ব্যবধান দূরত্বের মধ্যেই গণ্য নয়। স্থর্যের পরেই নক্ষত্রমহলে যাকে আমাদের পাড়া-পড়শি বলা চলে তার থেকে আলো আসতে লাগে তিন-চার বছর। তার চেয়ে যে-সব নক্ষত্র দূরের তাদের দূরত্ব অনুসারে পৃথিবীতে আলো পৌঁছোতে অনেক শত, অনেক হাজার, অনেক লক্ষ বছর লাগে। সাধারণত আমরা দূরত্ব গনি মাইল বা ক্রোশ হিসেবে, কিন্তু এসব নক্ষত্রের দূরত্ব মাইল বা ক্রোশ হিসেবে গণনা করতে গেলে সংখ্যা-সংকেত বিপুল জায়গা জুড়বে, অঙ্কের বোঝা দুর্বহ হয়ে উঠবে, আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীর দূরত্ব হবে প্রায় পঁচিশ লক্ষ কোটি (২৫,০০০,০০০,০০০,০০০) মাইল। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকের সীমানায় ঢুকলেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপের মতো শোনায়। তাই এসব ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আর-এক সংকেত ব্যবহারে লাগিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে আলো এক সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল পথ পেরিয়ে যায়; এক বছরে আলো যতটা পথ চলে, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ অষ্ট আশি হাজার কোটি মাইল, তাকে বলা হয় আলো-বছর, ইংরেজিতে বলে লাইট ইয়ার (Light-Year)। এই আলো-বছরকেই দূরত্ব পরিমাপের একক ধরে মহাশূন্যে জ্যোতিষ্কের দূরত্ব বর্ণিত হয়।

স্থর্য-পৃথিবীর ব্যবধানের মধ্যে আমরা অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপে আলোর দৌড় দেখতে পাই; আগেই বলা হয়েছে এই শূন্য পেরিয়ে স্থর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসে আট মিনিটে। অর্থাৎ ঠিক দিক্‌সীমানায় যখন স্থর্যকে দেখি, আসলে তার আট মিনিট আগেই সে এসেছে; এতটুকু দেরিতে বিশেষ কিছু এসে যায় না, স্থর্যের প্রায় টাটকা খবরই মিলে। কিন্তু এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের দূরত্ব লক্ষ লক্ষ আলো-বছর,

তার মানে আকাশে আমরা যে তাদের দেখছি তা এই মুহূর্তের দেখা নয়; যে-আলো আমাদের চোখে এখন এসে পৌঁছোল সেটা লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোনো। তাদের এখনকার আলো পেতে হলে আরও লক্ষ লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এদের কেউ যদি আজ তার আলোর সম্বল ফুঁকে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে তাহলে এই ঘটনা জানা যাবে লক্ষ লক্ষ বছর পরে। বিভিন্ন নক্ষত্রের যে বিভিন্ন খবর পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি খবর নিশ্চিত যে জ্যোতি দিয়েই তাদের সৃষ্টি, আর সেই সৃষ্টি প্রকাশ পাচ্ছে নানা অবস্থায়। ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় কেউ বা শিশু, কেউ বা যুবা, কেউ বা বৃদ্ধ; নক্ষত্রের ভিড়ের মধ্যেও দেখি কেউ বা নবীন, কেউ বা প্রৌঢ়, কেউ বা প্রাচীন। এই প্রৌঢ় নক্ষত্রের দলেই সূর্যের স্থান। একটা কথা এখানেই বলে রাখা দরকার, আমরা ভাবি সূর্য বুঝি নিতান্তই আমাদের, আর তার আলোর দানে আমাদেরই দাবি সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সূর্যের দেহ থেকে যে প্রচুর আলো বেরিয়ে চলেছে তার একটুখানি মাত্র আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, অনেকখানিই চলে যায় আকাশে, কোথায় যায়, কোন্ কাজে লাগে কেউ বলতে পারে না। এই আলোর সঙ্গে মিশে আছে তাপ; সূর্যের সমস্ত আলো তার তাপ নিয়ে যদি পৃথিবীতে কেন্দ্রীভূত হ'ত, তাহলে সেই সম্মিলিত তাপশক্তির প্রভাবে পৃথিবীজোড়া এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হ'ত, মুহূর্তেই পৃথিবীসুদ্ধ আমরা লোপ পেয়ে যেতাম। সূর্যের আত্মীয়তার অত্যধিক বাড়াবাড়ি অনিবার্য ধ্বংসের পথেই আমাদের ঠেলে নিয়ে যেত।

পৃথিবী-দেখা সহজ চোখে একদিন মানুষ দেখেছিল নক্ষত্রবিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবীর আসন স্থির হয়ে আছে। দূরবীন সৃষ্টির পর, এই ছেলে-ভুলানো খবর বাতিল করে দিয়ে, সে তার চোখ বানিয়েছে বিশ্ব-

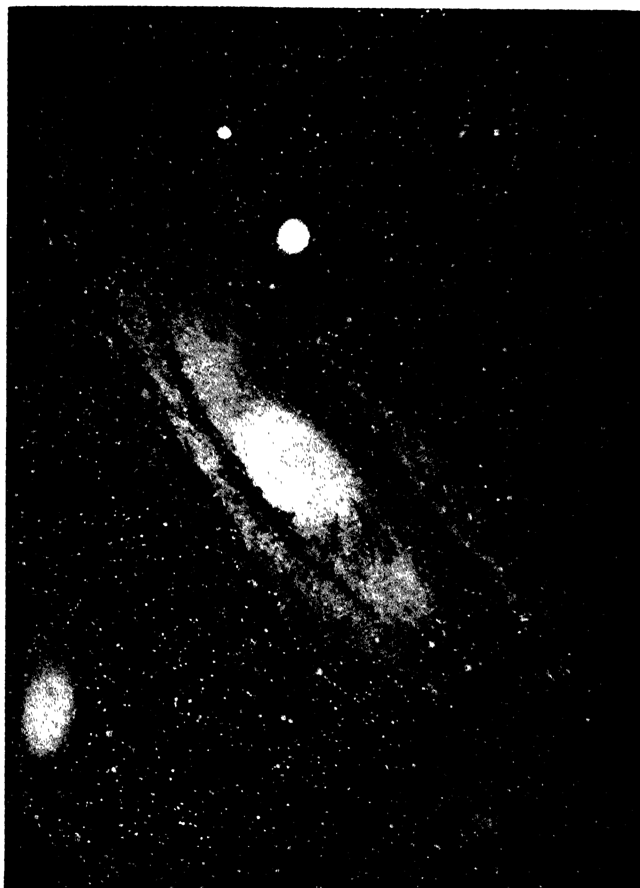
দেখা। তার এই যন্ত্রচক্ষুর শক্তি বাড়তে বাড়তে বেড়ে চলল তার দৃষ্টির পরিধি। যেখানে আগে ছিল ফাঁকা শূন্য সেখানে দেখা দিল অসংখ্য নক্ষত্র, জানা গেল কোটি কোটি দলবাঁধা নক্ষত্র নিয়েই এই নক্ষত্রবিশ্ব। কিন্তু বাকি রইল আরও অনেক যারা দুরবীনদৃষ্টির অতীত, যাদের আলো এত ক্ষীণ যে দুরবীনের ভিতর দিয়ে এলেও দৃষ্টির বোধে কোনও সাড়া দেয় না। তাদের খবর পাওয়া গেছে দুরবীনের সঙ্গে ফোটোগ্রাফ তোলা ক্যামেরা লাগিয়ে, ক্যামেরার প্লেটে তারা রেখে গেছে তাদের স্থায়ী স্বাক্ষর। এই ভাবেই সন্ধান মিলেছে নক্ষত্রের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড়ো হাজার হাজার জ্যোতিষ্কের; এদের বলা হয় নীহারিকা, ইংরেজিতে বলে নেবুলা (Nebula)। রাত্রের আকাশে, খালি চোখে এদের দু-একটিকে দেখতে পাই লেপে দেওয়া আলোর মতো। এদের মধ্যে কতকগুলি সুদূর-বিস্তৃত সূক্ষ্ম গ্যাসের মেঘ, আবার কতকগুলি অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ। এই বিশ্বে নীহারিকার সংখ্যা কত তা ঠিক করে বলা চলে না, তার কারণ প্রায়ই নূতন নীহারিকার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে; দুরবীনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। নানা রকমের নীহারিকা আকাশে দেখা গেছে। কোনও গ্রহকে দুরবীনে দেখলে যেমন থালার মতো দেখায় তেমনি এক রকমের নীহারিকা আছে যাকে দেখতে অনেকটা সেই রকমই মনে হয়। আমাদের ছায়াপথের ভিতরেই এরা রয়েছে; এদের একটা বিশেষত্ব এই যে এদের প্রত্যেকেরই মাঝখানে আছে একটি নক্ষত্র, আর এই নক্ষত্রকে ঘিরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে জ্বলন্ত বাষ্পের একটি মণ্ডল। কেন্দ্রস্থিত এই নক্ষত্র এত উজ্জ্বল যে দশ বিশটা সূর্যের আলো সে একাই ছড়িয়ে দেয়। আরও এক রকমের নীহারিকার খোঁজ মিলেছে যার সুনির্দিষ্ট কোনও আকার নেই; এর বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধু একটিমাত্র নক্ষত্র নয়, এক বৃহৎ নক্ষত্রমণ্ডলীকে

ঘিরে আছে জ্বলন্ত বাষ্পের একটি উজ্জ্বল মেঘ। হাজার হাজার সূর্যের আলো এই নীহারিকা একাই ছড়িয়ে দেয়।

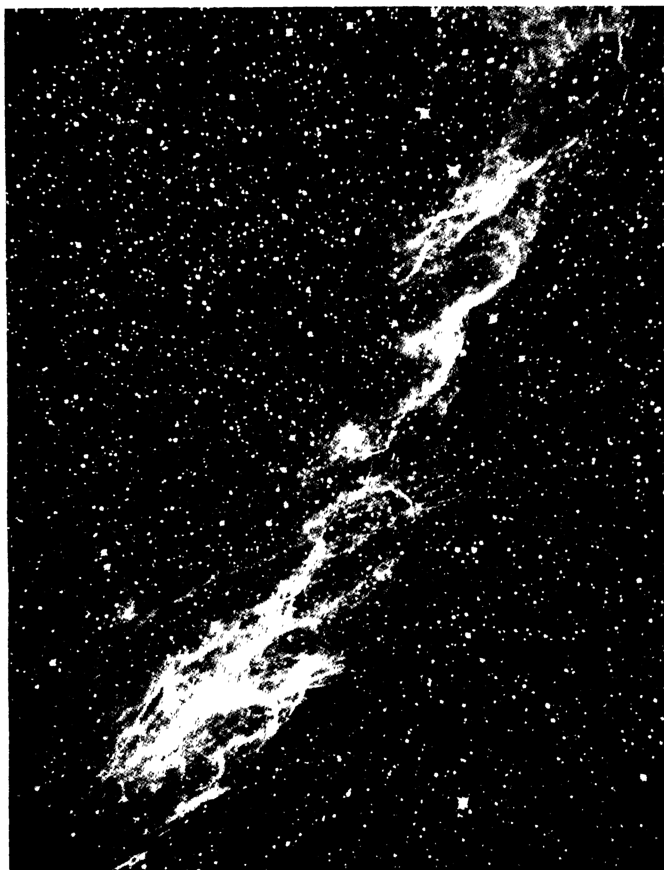
আজকাল জানা গেছে আমাদের সূর্য তার গ্রহপরিবার নিয়ে একটি বৃহৎ নীহারিকার ভিতর রয়েছে, যাকে ছায়াপথ বলি বোধ হয় তাই তার সীমানা। কোটি কোটি নক্ষত্র এর দখলে। এর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছোতে লাগে প্রায় ন'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বছর। আমাদের সৌরজগৎ সেকেণ্ডে প্রায় ১৭৫ মাইল বেগে ঘুর খাচ্ছে এই ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে, একপাক ঘুরতে তার লাগে প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি বছর। হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবীতে প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে সূর্য এই নীহারিকার নাভিকে প্রদক্ষিণ করেছে চারবার। চলতি গাড়ির চাকা থেকে কাদা যেমন বাইরে ছিটকে পড়ে, সূর্যও তার ঘোরার বেগে এই নক্ষত্রচক্র থেকে তেমনি করেই ছিটকে পড়ত, কিন্তু এই চক্রের কোটি কোটি নক্ষত্রের সম্মিলিত প্রবল আকর্ষণ তাকে এই অপঘাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে একটা সুনিয়ন্ত্রিত পথে চালিত করছে। কতগুলি নক্ষত্রের টানে নির্দিষ্টপথে সূর্যের এই নির্দিষ্ট গতি সম্ভব হয়েছে তার হিসেব অঙ্ক কষে জানা গেছে, এই নীহারিকায় হাজার কোটির চেয়েও বেশী নক্ষত্র আছে। সূর্যকে ঠিক রাস্তায় টেনে রেখেছে যারা তাদের মধ্যে বহুকোটি নক্ষত্রই আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। এণ্ড্রোমিডা (Andromeda) নক্ষত্রমণ্ডলীতে একটি প্রকাণ্ড নীহারিকার সন্ধান মিলেছে, এর আকার অনেকটা গাড়ির চাকার মতো, চাকার মতো এ আবার ঘুরও খাচ্ছে; এক পাক ঘুরতে এর লাগে প্রায় দুকোটি বছর। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় সাড়ে আট লক্ষ আলো-বছর। অসংখ্য নক্ষত্রের সন্নিবেশেই এই নীহারিকা, গতি আর আকর্ষণের টানাটানিতে ধরা পড়েছে এক বিরাট ঘূর্ণিপাকের আবর্তে। এই নক্ষত্র-

বিশ্বের ভিতর একটা জিনিস চোখে পড়ে যে এর সর্বত্রই রয়েছে এক ঘূর্ণিনাচ চলা আর টানার ছন্দে; সর্বত্রই দুই বিপরীত শক্তির ক্রিয়া, মুক্তি আর বন্ধন, গতি আর সংযম, এদের সামঞ্জস্য করে নিয়েই সব কিছু এই বিশ্বে স্থিতি পেয়েছে। কোথাও এই অসীম সামঞ্জস্যের এতটুকু অভাব ঘটলে বিশ্বে এক অনিবার্য প্রলয়কাণ্ড হত, নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠোকাঠুকি হয়ে বিশ্ব যেত চুরমার হয়ে।

সব চেয়ে দূরের যে-নীহারিকার ছবি তোলা হয়েছে তার থেকে পৃথিবীতে আলো আসতেই লাগে প্রায় ৫০ কোটি বছর; এর দূরত্ব জানার পরে নক্ষত্রবিশ্বের আয়তন কত বড়ো তার একটা হিসেব পাওয়া গেছে। এখন এটুকু বলা যেতে পারে যে আমাদের পরিচিত বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে আলো পৌঁছোতে লাগে ৩।৪ হাজার কোটি বছর; এই হচ্ছে আমাদের জানা বিশ্বের "এখনকার" আয়তন। অনেকে আবার বলেন যে এর আয়তন নাকি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, ১৫০ কোটি বছর পরে বিশ্বের আয়তন হবে এখনকার দ্বিগুণ। বিশ্বের আয়তন বাড়ছে কী করে সে-সব জটিল বিষয়ের আলোচনা দুর্গম গণিত শাস্ত্রের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, সাধারণের কাছে সহজবোধ্য নয়, এখানে তার আলোচনা করতে গেলে মনকে নিরর্থক পীড়িত করা হবে; তবে খবরটা জেনে রাখা ভালো। একটা কথা বলে রাখা দরকার যে নক্ষত্রবিশ্বের "এখনকার" আয়তনের কথা যা বলছি তা মোটেই এখনকার নয়; কারণ যে-সব নীহারিকা থেকে আলো আসতে ৫০।৬০ কোটি বছর লেগেছে তাদের এখনকার খবর, আমাদের শক্তির মাপে, আরও ৫০।৬০ কোটি বছর পরে পাবার কথা। আজ যে-খবর পাচ্ছি তা ঐ নীহারিকার ৫০।৬০ কোটি বছরের পুরোনো খবর; ইতিমধ্যে এর অবস্থা কী হয়েছে তা কেবল আন্দাজেই বলা চলে।



অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা



গ্যাসদেহী নীহারিকা

এই নক্ষত্রসংঘটিত নীহারিকাগুলি যেন মহাশূন্যে এক-একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো (Island Universe)। নক্ষত্রদ্বীপগুলি থেকে একটা অতি আশ্চর্য খবর এসে পৌঁছেছে যে এরা ছুটে চলেছে প্রচণ্ডগতিতে এক অজানা লক্ষ্যের দিকে। শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন যে কোনো কোনো নক্ষত্রদ্বীপের গতি সেকেণ্ডে ২৪।২৫ হাজার মাইল। এই সব অতিবৃহৎ বস্তুসংঘের এত প্রচণ্ড গতি অনেক বিজ্ঞানীই স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেন যে-আলোর পরীক্ষা থেকে এদের গতি স্থির করা হয়েছে, আলো-পরখ-করা যন্ত্রে ধরা দেবার আগে সেই আলো বহুকোটি বছর ধরে একটানা পথ চলেছে এই বিশ্বের মহাশূন্যের মধ্যে ; সুদীর্ঘ পথ চলার যে ক্লান্তি আলোর পক্ষেও তা খুব অসংগত নয় বলেই তাঁরা অনুমান করেন। এই "ক্লান্ত আলোর" (tired light) পরীক্ষার উপর নির্ভর করে এত বড়ো একটা প্রশ্নের যাচাই করার পক্ষপাতী তাঁরা নন। আরো বেশি শক্তিশালী দুরবীন তৈরি হলে এদের গতি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য আরও তথ্য যখন জানা যাবে তখন হয়তো এই জটিল বিষয়ের একটা মীমাংসা হবে। বিশ্বের আয়তন অতি প্রকাণ্ড হলেও নির্দিষ্ট এই বাণীই বিজ্ঞানীরা এতদিন ধরে প্রচার করে আসছেন, কিন্তু নক্ষত্রদ্বীপগুলির এই প্রচণ্ড গতি যদি পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে বিশ্বকে বলতে হবে অসীম, আর চলা-টানার সামঞ্জস্যে নক্ষত্রদ্বীপগুলির ভিতর একটা সাম্যস্থিতি আছে বলে যে-ধারণা এতকাল মানুষের মনে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে তা একেবারে নিরর্থক বলে বাতিল করে দিতে হবে। তখন নূতন করে ভাবতে হবে—এই বিশ্বের সীমাহীন শূন্যের মধ্যে নক্ষত্রদ্বীপগুলি, প্রকৃতির শাশ্বত নিয়ম গতি আর সংযমের বাঁধনে ধরা না দিয়ে, এক অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে। এই নূতন চিন্তাধারা নির্দেশ করেছেন

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন; তাঁর মতে বস্তুপুঞ্জের মধ্যে যেমন একটা মহাকর্ষের টান (Gravitation) রয়েছে তেমনি একটা মহাবিকর্ষের ঠেলাও (Cosmic Repulsion) তাদের ভিতর সক্রিয় হয়ে, তাদের ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে। বস্তুপুঞ্জ কাছাকাছি থাকলে মহাকর্ষের টানটা প্রবলতর হয়ে তাদের সংযমের বাঁধনে ধরে রাখে, কিন্তু দূরত্বমাত্রা একটা নির্দিষ্ট সীমা পেরোলে এই মহাবিকর্ষের ঠেলাটাই প্রবলতর হয়ে তাদের নিরন্তর দূরে সরিয়ে দিতে থাকে। অসীম আকাশে এই মহাবিকর্ষ প্রাধান্য লাভ করেছে, তাই তার প্রভাবে নক্ষত্রদ্বীপগুলির ভিতর দূরত্ব ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

নক্ষত্র-পরিচয়

এখন স্বভাবতই একটা প্রশ্ন মনে জাগে জ্যোতির আধার যে-নক্ষত্র-লোক, যার সঙ্গে একমাত্র আলোর যোগ ছাড়া আমাদের আর কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নেই, তার অন্তর্নিহিত খবর আমরা পৃথিবীতে বসে পেলাম কী করে। নক্ষত্রের ছড়িয়ে দেওয়া আলোর মধ্যেই লুকোনো রয়েছে তার উপাদান-পদার্থ, ওজন, আয়তন, উষ্ণতা, গতি ও দূরত্বের সব খবর; মানুষ এই আলোর যেন বুক চিরে সব খবর আদায় করে নিয়েছে। কি করে তা সম্ভব হ'ল সেকথাই এখন কিছু আলোচনা করব।

তিনপিঠওয়ালা কাঁচ বা প্রিজ্‌মের (Prism) ভিতর দিয়ে সূর্যের সাদা আলো পার করলে তার থেকে সাতরঙের আলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে; একেই বলে সূর্যের আলোর বর্ণালী (Solar Spectrum)। পরে পরে যে-রং দেখা যায় তাদের নাম দেওয়া হয়েছে, বেগনি (Violet), অতিনীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green),

হল্‌দে (Yellow), নারাঙ্গি (Orange), ও লাল (Red)। এই সাতটা রং আমরা চোখে দেখি, কিন্তু বেগনি ও লালের দুইপ্রান্ত ছাড়িয়ে আরও অনেক রশ্মি আছে যারা আমাদের সহজদৃষ্টির বোধে সাড়া দেয় না; যে-রশ্মি বেগনি রঙের সীমা পেরিয়েছে তার নাম "বেগনি-পারের রশ্মি", ইংরেজিতে বলে Ultra-Violet Rays। আর যে-রশ্মি লাল রঙের সীমার বাইরে রয়েছে তার নাম "লাল-উজানি রশ্মি", ইংরেজিতে বলে Infra-Red Rays। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে Ritter এই এই অদৃশ্য বেগনিপারের রশ্মি আবিষ্কার করেন তার রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করে; এর আগের বছর Sir William Herschell লাল-উজানি রশ্মির সন্ধান পান তার তাপের প্রভাব দেখে। এই অদৃশ্য রশ্মির পরীক্ষা যতই এগিয়ে চলল দেখা গেল বর্ণালীর বেশীর ভাগ স্থানই জুড়ে আছে এই অ-দেখার দল, আর রঙিনের দল ঠেসাঠেসি ভিড় করে আছে অল্পপরিসর স্থানে। অর্থাৎ যে-রশ্মি সহজ চেতনায় আলো বলে ধরা দেয় না তারাই দখল করে আছে প্রায় সমস্ত বর্ণালী, আর যে-আলোর সাহায্যে বিশ্বজগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তুলনায় তারাই হয়ে রইল অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। এখানে বলে রাখা ভালো যে এই অদৃশ্য রশ্মিগুলিকেও বিজ্ঞানের ভাষায় আলো নাম দেওয়া অসংগত হবে না, কারণ দেখা ও অ-দেখারা একই জাতের, সগোত্র; কোনও একটা বিশেষ শক্তির বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ ছাড়া এদের প্রকৃতিগত কোনও প্রভেদ নেই। কোনও উজ্জ্বল পদার্থের, তা সে দূরেই থাক্ আর সামনেই থাক্, সম্যক্ পরিচয় পেতে হ'লে এই অদৃশ্য আলোর পরীক্ষা অপরিহার্য।

এখন দেখা যাক দীপ্তিমান বস্তুপুঞ্জের অন্তরের খবর তাদের ছড়িয়ে দেওয়া আলোর বর্ণালী থেকে কী করে জানা সম্ভব হ'ল। কঠিন জিনিস

যথেষ্ট তেতে উঠলে আলো ছড়িয়ে দেয়, এই আলোকে প্রিজমের সাহায্যে ভাঙলে নানা রঙের শ্রেণী পাশাপাশি দেখা যায়। এই বর্ণালী নিরবচ্ছিন্ন, তার রশ্মির মাঝে মাঝে কোনো ফাঁক থাকে না; এ'কে বলব অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী (Continuous Spectrum)। কিন্তু অত্যধিক তাপ-মাত্রায় গরম করলে কঠিন জিনিস যখন বায়বীয় অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয়, তখন তার আলোর বর্ণালীতে একটানা আলো পাওয়া যায় না, আলোহীন ফাঁকা জায়গার মাঝে মাঝে থাকে আলাদা আলাদা উজ্জ্বল রেখা; এর নাম দেওয়া যেতে পারে রেখাবর্ণালী (Line Spectrum)। পরীক্ষা করে জানা গেছে যে দীপ্ত বায়বীয় অবস্থায় প্রত্যেক মৌলিক জিনিস থেকে যে-সব আলো বেরোয় তাদের প্রত্যেকের লক্ষণ আলাদা, অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের আলোর রেখা-বর্ণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একটার সঙ্গে আর-একটা মেলে না। ছড়িয়ে দেওয়া আলোর বর্ণালীর এই বৈষম্যের উপরই জ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জের মধ্যে তাদের উপাদান পদার্থ খোঁজ করার প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত। নক্ষত্রে যে-উত্তাপ আছে তাতে সেখানকার সকল পদার্থই বাষ্প আকারে দীপ্তিমান হয়ে আছে; তার আলোর রেখা-বর্ণালী পরীক্ষা করে নক্ষত্রের উপাদান পদার্থগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। নুন আমাদের নিত্যব্যবহার্য একটি সাধারণ যৌগিক পদার্থ, এর মধ্যে সোডিয়ম নামে একটি মৌলিক পদার্থ আছে। এই নুনকে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করলে তার থেকে এক হলদে আলো বেরিয়ে আসে; এই আলোর বর্ণালী পরীক্ষায় দেখা গেছে যে দুটি খুব কাছাকাছি হলদে রেখা ছাড়া তার মধ্যে আর-কোনও রঙের কোনো রেখা নেই। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে একমাত্র সোডিয়ম ছাড়া অন্য কোনো দীপ্তিমান পদার্থের বর্ণালীতে ওই জায়গাতে ওই দুটি হলদে রেখা পাওয়া যায়নি। যে-



হিলিয়ম

আকাশ

হিলিয়ম



এন. জি. সি. ২২১



এন. জি. সি. ৩৮৫



এন. জি. সি. ৪৮৮৪



সিংহমণ্ডলের নীহারিকা



নীহারিকার বর্ণালী

এটা ওরায়োনিস

সিরিয়াস্

ডেলটা জেমিনোরাম

ক্যাপেলা

আর্কটুরাস

বেটেলগো

নক্ষত্রের স্বাক্ষর

কোনো দীপ্ত বাষ্পপুঞ্জের (তার অবস্থান পৃথিবীতেই হ'ক বা বহুদূরবর্তী নক্ষত্রেই হ'ক) বর্ণালী পরীক্ষা করে ঠিক ঐ স্থানে ঐ হলদে রেখা দুটি যদি দেখতে পাই, নিশ্চিত বুঝব তাতে সোডিয়ম আছেই। তাপ দিলে সোডিয়ম থেকে যে-হলদে আলো পাওয়া যায় সেই আলো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা কোনো সোডিয়ম বাষ্পের ভিতর দিয়ে যদি আসে তবে তার বর্ণালীতে ঐ দুটি উজ্জ্বল হলদে রেখা আর খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু ঠিক ওই জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায় দুটি কালো রেখা (Dark Lines)। বিজ্ঞানী Kirchoff এই কালো রেখার কারণ নির্দেশ করেছেন। দীপ্তিমান কোনো বায়ব পদার্থের আলো সেই বায়বেরই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্তরের ভিতর দিয়ে আসার পথে সম্পূর্ণ শোষিত হয়, তাই তার বর্ণালীতে উজ্জ্বল রেখাগুলি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই সোডিয়মের উজ্জ্বল রেখাদুটির কোনও সন্ধান মেলে না। এক্ষেত্রে আলোর অভাবেই যে কালো রেখার সৃষ্টি তা নয়; বস্তুত যে-বায়ব আলো আটক করে সেও আপন উষ্ণতা অনুযায়ী আলো ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু তুলনায় তাপমাত্রা কম বলে এর আলো হয় অনেকটা ম্লান। দীপ্তিমান বায়বের উজ্জ্বল আলোর পাশে এই ম্লান আলো অনেকটা কালোর বিভ্রম জন্মায়। দীপ্ত বায়বীয় অবস্থায় মৌলিক জিনিসমাত্রেরই আলো ভেঙে প্রত্যেকটির রেখা-বর্ণালীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যার উপাদান পদার্থ অজ্ঞাত এমন কোনো নক্ষত্রের আলোর বর্ণালীর উজ্জ্বল বা কালো রেখাগুলি যদি এই তালিকাভুক্ত পরিচিত কোনো কোনো জিনিসের বর্ণালীর রেখাগুলির সঙ্গে ঠিক মিলে যায় তাহলে নিশ্চিত জানা যাবে যে ওই নক্ষত্রে অন্তত এই জানা জিনিসগুলি বায়ব অবস্থায় আছে। এখন দেখা গেল, পৃথিবীতে বসে, বহুদূরবর্তী নক্ষত্রের আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে, কী করে তাদের উপাদান পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

এখন সূর্যের অবস্থার কথা কিছু আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর পদার্থপুঞ্জ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা ৯২টি মৌলিক জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন; যে-সব মৌলিক পদার্থ পৃথিবীতে আছে সূর্যে তাদের সবগুলিই থাকা উচিত, কেননা পৃথিবী সূর্যেরই দেহজাত। সূর্যে যে-উত্তাপ আছে তাতে সেখানকার সব জিনিসই বাষ্প আকারে দীপ্তিমান হয়ে আছে। আলো-পরখ-করা যন্ত্র (Spectroscope) দিয়ে সূর্যের আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে প্রথমে মাত্র ৩৬টি মৌলিক জিনিসের সন্ধান সূর্যে পাওয়া যায়। বাংলার কৃতী বিজ্ঞানী অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নির্ধারিত নূতন সন্ধানপথে কাজ করে পৃথিবীর ৯২টি মৌলিক জিনিসের কয়েকটি ছাড়া বাকি সবগুলিরই খবর সূর্যে মিলেছে; যাদের খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি তাদের আলো সম্ভবত পৃথিবীর হাওয়া সম্পূর্ণ শোষণ করেছে। এভাবেই জানা গেছে পৃথিবী-সূর্যের উপাদান পদার্থে কোনো ভেদ নেই, এদের একমাত্র ভেদ অবস্থাগত, পৃথিবীর উপাদানগুলি আছে কঠিন অবস্থায়, সূর্যে সেই উপাদানগুলি আছে দীপ্তিমান বায়ব অবস্থায়।

সূর্যই একমাত্র নক্ষত্র যার নির্দিষ্ট আকার সম্বন্ধে খালি চোখেও আমরা খানিকটা আভাস পাই, কারণ নক্ষত্রজগতের দূরত্বের তালিকায় এর দূরত্বই সব চেয়ে নিচু ক্লাসের; আর-সব নক্ষত্রেরই দূরত্বমাত্রা এত বেশী যে পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীনেও আলোর বিন্দু ছাড়া তাদের আর-কোনো বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়েনি। সূর্যেরই এমন গ্রহ আছে যার দূরত্ব এত বেশী যে সেখান থেকে দেখলে সূর্যকে তারার মতোই আলোর বিন্দু বলে মনে হবে। আগেই বলেছি পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯৩,০০০,০০০ মাইল; ছোটো পৃথিবীর মানুষ আমরা, এতটা দূরত্ব ধারণায় আনতে পারি না। সংখ্যা দিয়ে বলবার চেষ্টা না করে

একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে বললে হয়তো এই দূরত্বের ধারণা অনেকটা সহজ হতে পারে। মনে করা যাক এমন একটা যন্ত্র আমরা তৈরি করতে পারি যার সাহায্যে পৃথিবী থেকে সূর্যে পৌঁছনো সম্ভব; এই যন্ত্র যদি ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে একটানা চলতে থাকে, তাহলে সূর্যে পৌঁছোতে আমাদের লাগবে ১০০ বছরেরও বেশী। সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার মাইল; ১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক লাইনে রাখলে সূর্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছোতে পারে। সূর্যের ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ বেশী, তাই তার টানের জোরও অত্যধিক; এই টানের জোরে সে পৃথিবীকে আপন অধিকারে রেখেছে। একমাত্র এই টানটাই যদি থাকত তাহলে তার প্রভাবে পৃথিবী সূর্যের গায়ে গিয়েই হয়তো পড়ত, আর মুহূর্তেই লোপ পেত তার অস্তিত্ব; কিন্তু সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী এক বৃত্তপথে ঘুরছে সেকেণ্ডে প্রায় উনিশ মাইল বেগে, চক্রপথে এই গতির ফলে তাই পৃথিবীর মধ্যে জেগে উঠেছে কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) এক শক্তি। সূর্যের টান ও পৃথিবীর এই বিপরীতমুখী গতি এই দুই প্রতিকূল শক্তির সামঞ্জস্য হয়েছে বলেই অপঘাতের হাত এড়িয়ে পৃথিবী আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে। নিরাপদে সূর্যে যাওয়া সম্ভব হলেও তার প্রবল টানে আমাদের ওজন বেড়ে যাবে ২৮ গুণ, অর্থাৎ পৃথিবীতে যে-মানুষের ওজন ২ মন, সূর্যে গেলে তার ওজন দাঁড়াবে ৫৬ মন।

দেখে মনে হয় সূর্য স্থির হয়ে আছে, আসলে কিন্তু এক কাল্পনিক মেরুদণ্ডের চারদিকে সে ক্রমাগত ঘুরছে, এক পাক ঘুরতে লাগে প্রায় ছাব্বিশ দিন। কী উপায়ে সূর্যের এই আবর্তন-সময় জানা গেল তা স্থির করেছেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। দিনের বেলা খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকানো যায় না, কিন্তু খুব ভোরে যখন তার আলোতে চোখ

ধাঁধায় না তখন তার দিকে তাকালে হয়তো দেখা যাবে তার গায়ে কালো কালো দাগ আছে। হিসেব করে দেখা গেছে এক-একটি কালো দাগ আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ঢের বড়ো। কখনো কখনো এত বড়ো বড়ো দাগ সূর্যের গায়ে প্রকাশ পায় যে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ একত্র জড়ো করলেও তার সমান হয় না; এই বড়ো দাগগুলি সব সময় থাকে না, তবে ছোটো ছোটো দাগ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। দুরবীনে এই দাগগুলিকে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়, ছোটো দাগগুলি কয়েকদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যায় কিন্তু বড়োগুলি দুতিন সপ্তাহ থাকে। দুরবীনের সাহায্যে দেখা গেছে যে এরা ক্রমাগত ডান দিকে ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে ঘুরছে এদের নিয়ে সূর্য। কোনো-একটি কালো দাগের উপর লক্ষ্য স্থির রেখে সূর্যের আবর্তনের সময়টা হিসেব করা হয়েছে, জানা গেছে এক পাক ঘুরতে সূর্যের লাগে প্রায় ছাব্বিশ দিন।

সূর্যের গায়ে এই যে সব কালো কালো দাগ দেখা যায় তাদের মূলে রয়েছে তার ভিতরকার অগ্নিকাণ্ডের তুমুল তোলপাড়। প্রচণ্ড উত্তাপে সূর্যের উপরিতলের পদার্থপুঞ্জ ক্রমাগত আলোড়িত হচ্ছে, কিন্তু তার অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ও চাপ অত্যধিক হওয়ায় সময় সময় ভিতরকার উত্তপ্ত বাষ্পপুঞ্জ উপরকার আলোড়িত পদার্থকে ভেদ করে কুণ্ডলী আকারে ঘুরতে ঘুরতে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরের আবরণে তখন প্রকাণ্ড আবর্তের গহ্বর সৃষ্টি হয়; এর কেন্দ্রপ্রদেশ ঘোর কালো, তার নাম আম্ব্রা (Umbra), তার চারদিকে অপেক্ষাকৃত কম কালো একটি বেষ্টনী যার নাম পেনাম্ব্রা (Penumbra)। সূর্যের ভিতরকার উত্তপ্ত পদার্থ যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন তার উপর থেকে চাপ কমে যেতেই প্রসারিত হয়ে তা ঠাণ্ডা হতে থাকে। তাপ কমতেই তার দীপ্তিও কমে, তখন সেই অংশ চারদিকের উদ্দীপ্ত অংশের তুলনায় কালো

দেখতে হয়। এই অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল অংশের আলো যদি বন্ধ করা যেত তাহলে অতি তীব্র দেখা যেত এই কালো দাগের জ্যোতি। সূর্যের বহিরাবরণ ভেদ করে যে-বাষ্পপুঞ্জ বাইরে বেরিয়ে আসে, অনেক সময় তা সূর্যের দেহ থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল উর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত হয়; সূর্যগ্রহণের সময় দেখা যায় এই জ্বলন্ত বাষ্প অগ্নিশিখার (Solar prominence) মতো সূর্যের পরিধি অতিক্রম করে বহুদূরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ঘণ্টায় প্রায় তিন লক্ষ মাইল পথ পার হয়ে যায় এত প্রচণ্ড এর গতি। এই উত্তপ্ত বাষ্পপুঞ্জের মধ্যে থাকে পরমাণু ও পরমাণুভাঙা বিদ্যুৎকণা; সূর্য থেকে ছাড়া পেয়ে এই সব বিদ্যুৎকণা প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। পৃথিবীর চুম্বকশক্তির প্রভাবে এরা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে ধাবিত হয়, তখন তাদের প্রচণ্ড সংঘাত ঘটে হাওয়ার অণুর সঙ্গে; ফলে হাওয়ার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, তার থেকে সৃষ্টি হয় নানা রঙের আলো। এই আলোই মেরুজ্যোতিঃ (Aurora) নামে পরিচিত। এই যে বিরাট আয়তনের সূর্য, যার মধ্যে নিরন্তর চলেছে প্রলয়ংকর অগ্নিকাণ্ড, তাকে আমরা দেখি ছোটো একখানি থালার মতো, কিন্তু তার অগ্নিআবর্তের তুমুল আলোড়নের কোনো খবরই বাইরে থেকে জানতে পারি না।

এইতো গেল সূর্যের কথা; এবার অন্যান্য নক্ষত্রের কিছু খবর নেওয়া যাক। যে-সব নক্ষত্র ছায়াপথের অন্তর্গত তাদের পরস্পরের আয়তন, উজ্জ্বলতা, ঘনত্ব ও রঙের অনেক প্রভেদ আছে। কেউ বা আয়তনে সূর্যের চেয়ে দশকোটি গুণ বড়ো, আবার কেউ বা দশলক্ষ গুণ ছোটো; কেউবা সূর্যের চেয়ে দশহাজার গুণ বেশী আলো দেয়, কেউ বা দেয় দশহাজার ভাগেরও কম। কারও পদার্থপুঞ্জ অত্যন্ত ঘন কারও বা অত্যন্ত পাতলা; কারও উপরিতলের তাপমাত্রা ত্রিশহাজার ডিগ্রী

সেণ্টিগ্রেড, কারও বা তিন হাজার সেণ্টিগ্রেডের বেশী নয়। কারও উজ্জ্বলতা স্থির, কারও বা দীপ্তি ভিতরেরই কোনো জোয়ার ভাঁটায় একবার বাড়ে একবার কমে। কেউবা চলেছে একা একা, কেউবা চলেছে সঙ্গী নিয়ে। কারও বা রং নীল, কারও বা সাদা, কারও বা হলদে, আবার কারও বা লাল। রঙের বিশেষত্ব অনুসারে নক্ষত্রগুলিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ; রঙের ভেদ ঘটলে এদের রেখা-বর্ণালী ও তাপমাত্রারও ভেদ ঘটে।

(১) নীল নক্ষত্র (Blue Stars, B-type)—নক্ষত্রদের মধ্যে এদের তাপমাত্রাই সব চেয়ে বেশী, প্রায় ২৩,০০০ ডিগ্রী থেকে ৫০,০০০ ডিগ্রীর ভিতর। এই জাতীয় নক্ষত্রের বিশেষত্ব এই যে, এদের প্রত্যেকের আলোর বর্ণলিপিতে হিলিয়ম গ্যাসের রেখা-বর্ণালী পাওয়া যায়। কাল-পুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীতে (Orion) এরকম নক্ষত্রের সন্ধান মিলেছে। (২) নীলাভ-সাদা নক্ষত্র (Bluish-White Stars, A-type)—এরাও বেশ উত্তপ্ত, তাপমাত্রা দশ হাজার ডিগ্রীর উপরে। এদের আলোতে হিলিয়ম গ্যাসের রেখা-বর্ণালী নেই, কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাসের বর্ণালী উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। লুব্ধক (Sirius বা Dog-Star) নামে যে-নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটতম উজ্জ্বল প্রতিবেশী তা এই জাতীয়। (৩) সাদা নক্ষত্র (White Stars, F-type)—এদের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, ৭।৮ হাজার ডিগ্রী। এসব নক্ষত্রের আলোতে হাইড্রোজেন গ্যাসের বর্ণালী অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে, কিন্তু ধাতব পদার্থের, বিশেষ করে, ক্যালসিয়ম (Calcium) ধাতুর বাষ্পের বর্ণালী বেশ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। Canopus এই জাতের নক্ষত্র। (৪) হলদে নক্ষত্র (Yellow Stars, G-type)—এরা আরও ঠাণ্ডা, তাই রঙ হয়েছে একটু হলদে, তাপমাত্রা পাঁচ ছয় হাজার ডিগ্রী। এদের আলোতে ধাতব পদার্থের

রেখা-বর্ণালীই খুব বেশী থাকে, বিশেষ করে লোহার বাষ্পের হাজার হাজার বর্ণরেখার (Spectral lines) সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের সূর্য একটি হলদে নক্ষত্র। (৫) নারাঙ্গি-নক্ষত্র (Orange Stars, K-type)—এদের তাপমাত্রা চার পাঁচ হাজার ডিগ্রী; আলোতে ধাতব পদার্থের আলো ছাড়া, নিম্ন তাপমাত্রায় অবস্থিত আরও অনেক জিনিসের আলো পাওয়া যায়। স্বাতী নক্ষত্র (Arcturus) এই জাতীয়। (৬) লাল নক্ষত্র (Red Stars, M-type)—এদের তাপমাত্রা খুবই কম, তিন চার হাজার ডিগ্রী। আলোতে হাইড্রোজেন গ্যাসের বর্ণালীর সামান্য আভাস পাওয়া যায়, অন্য কোনো মৌলিক পদার্থের আলো এতে খুঁজে পাওয়া যায়নি, যৌগিক পদার্থের আলোর বর্ণালীর প্রাধান্য দেখা যায়। তাপমাত্রা কম বলেই মৌলিক জিনিসগুলি এদের মধ্যে জোড় বাঁধতে পেরেছে। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীতে এই জাতের একটি লাল-নক্ষত্র আছে; তার নাম আর্দ্রা (Betelgeuse)।

নক্ষত্রের তাপমাত্রা ও আলোর পরীক্ষা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের প্রথমে এ ধারণাই হয়েছিল যে, বৃহৎ আয়তন ও প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে এদের প্রত্যেকেরই আরম্ভ। ধীরে ধীরে উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়ে এরা প্রথমে হয় সাদা, তারপর হলদে ও সবশেষে হয় লাল। এই লাল নক্ষত্রের দল আরও ঠাণ্ডা হ'লে ছড়িয়ে দেবার মতো আলো তাদের ভাণ্ডারে থাকে না, তাই আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরূপ অনুমান করা হয় যে, আকাশে এই রকম অদৃশ্য জ্যোতিষ্ক অনেক রয়েছে• যারা আলোর প্রাচুর্যে একসময় ছিল খুবই উজ্জ্বল। নক্ষত্রের আরম্ভ যদি বিপুল আয়তন ও অপরিমিত তেজের সঞ্চয় নিয়ে হ'ত তাহলে বেটেল্‌জিউসের মতো লাল নক্ষত্র, যে তার তেজের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ করে দিয়ে বার্ধক্যের শেষ দশায় এসে ঠেকেছে, সে

আকাশে এত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় কী করে। এর দুটি কারণ থাকতে পারে, হয় বেটেল্‌জিউস্ আমাদের খুব কাছে আছে, আর তা না হলে অন্য নক্ষত্রের তুলনায় সে অতি বৃহৎ। পরীক্ষায় স্থির হয়েছে এর দূরত্ব ১৯০ আলো-বছর, কাজেই নৈকট্যের কারণটাকে বাতিল করে বৃহৎআয়তনের নজিরটাই মেনে নিতে হয়। এই নক্ষত্রের উপরিতলের উজ্জ্বলতার পরিমাপ থেকে এর আয়তন হিসেব করা হয়েছে; জানা গেছে এর ব্যাস প্রায় ২১ কোটি মাইল, কয়েক কোটি সূর্য অনায়াসে এর ভিতরে পুরে রাখা যায়। সূর্যের জায়গায় যদি বেটেল্‌জিউস থাকত তাহ'লে পৃথিবীসুদ্ধ আমরা সবাই তার ভিতরে ঢুকে যেতাম। বৃশ্চিক রাশিতে (Scorpio) জ্যেষ্ঠা (Antares) নামে আরও একটি উজ্জ্বল অতিকায় লাল নক্ষত্র আছে; তার দূরত্ব ১২৫ আলো-বছর ও ব্যাস ৩৯ কোটি মাইল; এর উজ্জ্বলতার কারণও এর অতি বৃহৎ আয়তন।

এই মহাকায় নক্ষত্রগুলির বিপুল আয়তনের কারণ এই নয় যে এদের বস্তুপরিমাণ অত্যধিক, অতিমাত্রায় ফেঁপে আছে বলেই এরা অতিকায়। নক্ষত্রের বস্তুপরিমাণ নির্ধারণ করা জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটা মস্ত সমস্যা ছিল; সার আর্থার এডিংটন সর্বপ্রথম এক গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে (Mass Luminosity Relation) প্রমাণ করেন যে নক্ষত্রের আসল-উজ্জ্বলতা (Intrinsic Luminosity) ও তার বস্তুমাত্রা এক অচ্ছেদ্য নিয়মে বাঁধা। কোনো নক্ষত্রের আসল উজ্জ্বলতা স্থির করতে পারলে এই সূত্রের সাহায্যে হিসেব করে তার ওজন বের করা যায়। একটা কথা বলে রাখা দরকার, নক্ষত্রের যে-উজ্জ্বলতা আমাদের চোখে পড়ে সেটা তার আসল উজ্জ্বলতা নয়, কারণ নক্ষত্রদের মধ্যে কেউ বা রয়েছে আমাদের খুব নিকটে, আবার কেউ বা আছে বহুদূরে। সূর্যকে

সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখি তার কারণ এ নয় যে তার আসল উজ্জ্বলতা সবচেয়ে বেশী ; বস্তুত সূর্য আমাদের নিকটতম নক্ষত্র বলেই তাকে এত উজ্জ্বল দেখায়। আকাশে এমন নক্ষত্র খুব কমই আছে যার আসল উজ্জ্বলতা সূর্যের চেয়ে কম, শুধু দূরে আছে বলে তাদের দেখি অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল। কোন নক্ষত্র ৩২ৡ আলো-বছর দূরে থাকলে তার যে-পরিমাণ উজ্জ্বলতা দেখা যাবে, জ্যোতিবিজ্ঞানে তাকেই ওই নক্ষত্রের আসল উজ্জ্বলতা বলে ধরে নেওয়া হয়। এভাবেই হিসেব করে দেখা গেছে যে অতিকায় অ্যাণ্টারেস নক্ষত্রের ওজন সূর্যের ওজনের মাত্র ৩০ গুণ, কিন্তু প্রায় দশ কোটি সূর্যকে সে তার দেহের ভিতর জায়গা দিতে পারে। এই বিপুল আয়তনের অনুপাতে তার বস্তুমাত্রা নিতান্তই কম, তাই ঘনত্বও এত কম যে পৃথিবীর কোনও পদার্থের সঙ্গে তার সুদূর তুলনাও চলতে পারে না ; জলের ঘনত্ব এর ঘনত্বের প্রায় ত্রিশলক্ষগুণ বেশী।

আবার বিপরীত দৃষ্টান্তও রয়েছে সাদা রঙের বেঁটে নক্ষত্রগুলিতে (White Dwarfs)। এদের ঘনত্বের কাছে লোহা, সোনা, প্ল্যাটিনমের মতো কঠিন ও ভারী জিনিসগুলি অত্যন্ত হালকা বলে মনে হবে ; অথচ এসব নক্ষত্র বাষ্পদেহী, জমাট কঠিন নয়। বায়বীয় পদার্থ যে কঠিন জিনিসের চেয়ে ঘন হতে পারে এই বেঁটে-নক্ষত্রের পরিচয় পাবার আগে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। কেমন করে এরা গ্যাসধর্মী পদার্থের সাধারণ ঘনত্বের গণ্ডি পেরিয়ে অসাধারণের দলে স্থান পেয়েছে তার খানিকটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে রয়েছে অপরিমিত তাপ ও বিরাট চাপ ; সূর্যের কেন্দ্রের কাছে তাপমাত্রা দুই কোটি ডিগ্রীরও বেশী এবং প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চাপ প্রায় আট কোটি মন। এসব বেঁটে-নক্ষত্রের কেন্দ্রে তাপমাত্রা আরও অনেক বেশী ; এই দুর্দমনীয় উত্তাপে এদের অভ্যন্তরে

এক দুর্নিবার প্রলয়কাণ্ড চলতে থাকে, তারই আঘাতে এদের উপাদান পদার্থের পরমাণুগুলি সব ভেঙে গুঁড়িয়ে কল্পনাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়। অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় পরমাণু যে-জায়গা জুড়ে থাকত, ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হওয়ার পর, তার টুকরোগুলি বিপুল চাপে ঠেসাঠেসি হয়ে আরও অনেক কম জায়গা জুড়ে থাকে; তার ঘনত্ব অত্যধিক বেড়ে যায় কিন্তু আয়তন হয় খর্ব। এইজন্যে বেঁটে-নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা হয় বেশী, আয়তন হয় ছোটো, কিন্তু ঘনত্বের বাড়াবাড়িতে তারা কঠিন পদার্থকেও ছাড়িয়ে যায়; অসাধারণ চাপ ও তাপের সঞ্চয় এদের ঠেলে দিয়েছে, সাধারণ পর্যায় থেকে, সৃষ্টিছাড়ার দলে। এমন অনেক নক্ষত্রের খোঁজ মিলেছে যাদের ঘনত্ব এত বেশী যে পৃথিবীর ঘনতম কঠিন পদার্থও তাদের কাছে ঘেঁষতে পারে না, তার মাত্রা যেন অসম্ভবের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে। যে-লুব্ধক নক্ষত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে তার একটি বেঁটে-সঙ্গী আছে, তার আকার পৃথিবীর চেয়ে একটু বড়ো, অথচ সূর্যের মতোই তার বস্তুপুঞ্জের পরিমাণ। এত ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে এতখানি বস্তুপদার্থ সংহত হয়েছে বলে এর ঘনত্ব জলের চেয়ে ৬০,০০০ গুণ বেশী হয়েছে; এর বস্তুপদার্থ দিয়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্স ভরলে তার ওজন হ'ত পঞ্চাশ মনের কাছাকাছি, বাক্সটাকে তুলতেই লাগত ২০।২৫ জন লোক। আরও একটি বেঁটে নক্ষত্রের (Van Maanen's Star) সন্ধান পাওয়া গেছে, যার আয়তন পৃথিবীর চেয়ে ছোটো কিন্তু বস্তুপদার্থ জলের চেয়ে প্রায় চার লক্ষ গুণ ঘন; এর ঘনত্ব কল্পনা করতে বুদ্ধিও হার মানে। নক্ষত্রজগতে একটা জিনিস বিশেষ করে চোখে পড়ে যে এদের পরস্পরের বস্তুমাত্রাতে বেশী ভেদ নেই, কিন্তু আয়তন ও তাপমাত্রার ভেদ এত বেশী যে অত্যধিক হালকা বস্তু থেকে কল্পনাতীত ঘন বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

অতিকায় দানব-নক্ষত্র (Giants) ও সাদা রঙের বেঁটে নক্ষত্র-গুলিকে সাধারণ নক্ষত্রের দলে ফেলা যায় না। মাঝারি আয়তন ও উষ্ণতা যাদের তারাই সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্র (Main Sequence Stars), যেমন সূর্য। আকাশে যে-সব নক্ষত্র আছে তাদের শতকরা আশিটি এই পর্যায়ভুক্ত; বেঁটের দলের চেয়ে এরা আয়তনে অনেক বড়ো হলেও এদের নিজেদের মধ্যে আয়তনের খুব বেশী ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু বস্তুপরিমাণ ও রঙের অত্যধিক ভেদ পরিলক্ষিত হয়। বর্ণালীর গাঢ় বেগনি থেকে অতি গাঢ় লাল আলো পর্যন্ত এদের রঙের মাত্রা। বস্তুপরিমাণের হিসেবে এদের পর পর সাজালে দেখা যায় যে এরা মোটা-মুটি বেগনি থেকে লাল রঙের পর্যায়ে সজ্জিত হয়েছে, বস্তুমাত্রা যাদের সব চেয়ে বেশী তাদের আলোর বর্ণালীতে বেগনি রঙেরই প্রাচুর্য। পর্যায়ক্রমে বস্তুমাত্রা কমিয়ে গেলে এদের বর্ণালীরও পরিবর্তন হতে থাকে নীল থেকে গাঢ় লাল পর্যন্ত, সঙ্গে সঙ্গে এদের উজ্জ্বলতার মাত্রাও কমতে থাকে। অতিকায় দানব নক্ষত্রের কেন্দ্রে তাপমাত্রা সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রের কেন্দ্রের তাপমাত্রার চেয়ে অনেক কম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর পরিমাণ দশ বিশ লক্ষ ডিগ্রী মাত্র হয়। তাপমাত্রা কম বলে এদের অভ্যন্তরে পরমাণুর দল, আংশিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও, একেবারে গুঁড়িয়ে যায় না; বেশীর ভাগ পরমাণুই প্রায় অটুট থাকে। তাই এসব পরমাণুর দল খুব ঠেসাঠেসি ভিড় করে থাকতে পারে না; অত্যধিক সান্নিধ্য বাঁচিয়ে বেশ দূরে দূরে থাকে বলেই এই জাতীয় নক্ষত্র আয়তনে হয় প্রকাণ্ড। যে-বেটেল্‌জিউস নক্ষত্রের কথা বলেছি তা এই পর্যায়-ভুক্ত দানব-নক্ষত্র। Omicron Ceti নামে আরও একটি অতিকায় দানবের সন্ধান পাওয়া গেছে যার ভিতরে অনায়াসে তিন কোটি সূর্যের স্থান হতে পারে। সাদা রঙের অনুজ্জ্বল একটি বেঁটে নক্ষত্র এর সঙ্গী,

অতিকায় দানবে ও অতিক্ষুদ্র বেঁটেতে মিলে জুড়ি-নক্ষত্রের (Binary System) সৃষ্টি করেছে। এই দানব নক্ষত্রগুলির উজ্জ্বলতা খুব বেশী, কিন্তু আয়তনের বিপুলতার দরুণ এদের উপরিতলের প্রতি বর্গইঞ্চি থেকে অতি অল্প তেজই বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। উপরিতল থেকে এত কম তেজ ছাড়া পায় বলে এরা অতিমাত্রায় গরম হ'তে পারে না, তাই এদের রঙ হয় সাধারণত লাল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হলদে হতেও দেখা যায়। বিপুল আয়তন ও রঙের বৈশিষ্ট্য থেকে এদের নাম দেওয়া হয়েছে লাল ও হলদে দানব (Red and Yellow Giants)।

যেসব নক্ষত্রকে চোখে দেখি একটিমাত্র আলোর বিন্দু বলে তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যার সঙ্গে দুই বা তারও বেশী নক্ষত্র মিলেছে। এদের বলব জুড়ি-নক্ষত্র (Binary System)। মহাকর্ষের টানে ধরা পড়ে এরা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে, জুড়ির মধ্যে যার বস্তুপরিমাণ কম প্রদক্ষিণের দায়টা পড়ে তারই উপর বেশী। কিন্তু যেক্ষেত্রে দুইয়েরই বস্তুমাত্রা অনেকটা পরস্পরের সমকক্ষ সেক্ষেত্রে একটি অপরটিকে টানের জোরে নিজের চারদিকে ঘোরাতে পারে না ; তখন দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়ে, একটা নির্দিষ্ট সাধারণ ভারকেন্দ্রকে (Common Centre of Gravity) লক্ষ্য করে, দুটি নক্ষত্র তাকেই প্রদক্ষিণ করে। জুড়ির মধ্যে দূরত্ব খুব বেশী না হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের প্রদক্ষিণের এক পাক শেষ হয়, আবার যাদের দূরত্ব খুব বেশী তাদের প্রদক্ষিণ-সময় গিয়ে পৌঁছয় হাজার বছরের কোঠায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করার সময় কিছুকালের জন্য একটি নক্ষত্র তার সঙ্গীকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দিয়েছে, তাতে এই সঙ্গীর উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় ; অল্পসময়ের মধ্যেই এরা একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার খুব ম্লান হয়ে যায়। উজ্জ্বলতার বিশেষ কমতি হ'ত

না যদি আড়ালকারী নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল না হ'ত ; আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে উজ্জ্বলতার তারতম্য খুব আছে, তাই জুড়ির অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল নক্ষত্রটিকে যখন তার অনুজ্জ্বল সঙ্গীটি সম্পূর্ণ আড়াল করে দেয় তখনই তার দীপ্তির হ্রাস ঘটে। প্রদক্ষিণের সময় যেন ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ লাগে আর গ্রহণ ছাড়ে। মিথুনরাশিতে (Gemini) ক্যাস্টর (Castor) নামে একটি নক্ষত্র আছে, চোখে দেখলে মনে হয় না এর কোনো সঙ্গী আছে, কিন্তু দূরবীনে দেখলে এর জুড়িটি সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। জানা গেছে এই দুইটি নক্ষত্রই আবার জুড়ি-নক্ষত্র, কিন্তু এই শেষ কথা নয়—এদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে আরও একটি নক্ষত্র, পৃথিবীর বৃহত্তম দুরবীনের তীক্ষ্ণচোখে আবার এরও একটি সঙ্গী ধরা পড়ে গেছে। একটিমাত্র আলোর বিন্দু ছাড়া যার মধ্যে আর-কোনো বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না তারই ভিতর আত্মগোপন করে রয়েছে ছয়টি নক্ষত্র, সম্পূর্ণ আলাদা তাদের গতি ও চলার পথ। কিন্তু এই যে শেষ-কথা তাও তো বলতে পারি না।

আরও একদল নক্ষত্র আছে যারা হঠাৎ অতিদ্রুত খুব উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, আবার ধীরে ধীরে তাদের পূর্বেকার ম্লান অবস্থায় ফিরে যায়। এই "হঠাৎ-জ্বলে-ওঠা" নক্ষত্রদের নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাব মনে ক'রে, এদের নাম দেওয়া হ'য়েছিল নতুন-নক্ষত্র। আট বছর আগে একটি অনুজ্জ্বল নক্ষত্র, যাকে শক্তিশালী দুরবীন ছাড়া দেখাই যায়নি, সে হঠাৎ এত বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে দীপ্তিতে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের সমতুল্য হয়ে খালি চোখে ধরা পড়েছিল। কিছুদিন এই অবস্থায় থেকে ধীরে ধীরে তার অতিরিক্ত দীপ্তি এল কমে, ম্লান হতে হতে কয়েক মাস পরে সে আবার মিলিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। যে-কয়দিন অত্যুজ্জ্বল অবস্থায় ছিল তার মধ্যে এই নক্ষত্রটি অপর্যাপ্ত

দীপ্তিমান গ্যাসের পুঞ্জ চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ছাড়া-পাওয়া এই বাষ্পপুঞ্জের কী হ'ল এ নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ আন্দাজ করেন যে এই প্রক্ষিপ্ত বাষ্পপুঞ্জ তাদেরই জন্মদাতা নক্ষত্রের প্রবল আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে, তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে হয়তো বা আমাদের গ্রহলোকের মতো আর-একটা নতুন গ্রহলোক সৃষ্টি করেছে। তাঁরা অনুমান করেন যে প্রত্যেক নক্ষত্রকেই, তার জীবদ্দশার একটা বিশেষ সময়ে, এরূপ অন্তর্বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, আর এই অবস্থায় তার দেহ থেকে প্রক্ষিপ্ত হয় দীপ্তিমান বাষ্পের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ; তার থেকেই গড়ে ওঠে তাদের প্রত্যেকের চারদিকে এক-একটা গ্রহলোক। এই মত মেনে নিলে বলতে হবে, কোটি কোটি নক্ষত্রসংঘটিত এই বিশ্বে কোটি কোটি সৌর-জগৎ রয়েছে। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রে গ্রহলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হ'লে যতটা শক্তিশালী দূরবীনের দরকার তা আজও তৈরি করা সম্ভব হয়নি ; যখন অন্য নক্ষত্রেও গ্রহের সন্ধান পাওয়া যাবে তখন এই মত স্বীকার করা কঠিন হবে না।

আরও একদল নক্ষত্র আছে যাদের উজ্জ্বলতা একবার বাড়ে একবার কমে। এই জাতীয় নক্ষত্রের প্রত্যেকটিই বেশ উজ্জ্বল ও আয়তনে প্রকাণ্ড ; ধীরে ধীরে এদের আয়তন ও উজ্জ্বলতা বাড়তে থাকে, তারপর কমতে কমতে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। কী করে এদের আয়তন ও দীপ্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তার কারণ আজও ঠিক জানা যায়নি। সিফিউস (Cepheus) নামে খ্যাত নক্ষত্রমণ্ডলীতে এদের প্রথম খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল বলে এদের বলা হয় সিফাইড (Cepheid Variables)। এই সিফাইডদের মধ্যে যে-নক্ষত্র যত বেশী উজ্জ্বল তার উজ্জ্বলতার কমি বেশি ঘটতেও তত বেশী সময় লাগে। এদের দীপ্তির হ্রাসবৃদ্ধির

সময়ের হিসেব করলে এদের আসল-উজ্জ্বলতা কতটা তা ধরা পড়ে। কোনো দীপ্ত পদার্থের উজ্জ্বলতাবোধ নির্ভর করে তার দূরত্বের উপর। দূরে নিয়ে গেলে আলো যে ম্লান দেখায় তার সেই ম্লানতার পরিমাণ নির্ণয়ের একটা নিয়ম আছে; আলোটা যেখানে আছে সেখান থেকে দ্বিগুণ দূরে সরিয়ে নিলে তার উজ্জ্বলতা, দ্বিগুণ না ক'মে কমে যায় চারগুণ, তিনগুণ দূরে সরিয়ে নিলে কমে নয়গুণ (৩×৩)। এভাবে আলো যতই দূরে সরানো হবে তার দীপ্তিও এই নিয়মেই (Inverse Square Law) কমতে থাকবে। এখন আমাদের চোখে এসব সিফাইড কী রকম উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় তা স্থির করলেই পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে এদের দূরত্বের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বলি—ধ্রুবনক্ষত্র (Pole Star) একটি সিফাইড, এর উজ্জ্বলতা পরিবর্তনের সময় চারদিন; তার থেকেই হিসেব করে স্থির হয়েছে যে ৫০০ সূর্য একত্র থাকলে যতটা উজ্জ্বল হ'ত এর আসল-উজ্জ্বলতা প্রায় ততটা, অথচ এর কাছে থেকে সূর্যের আলোর লক্ষ কোটি ভাগেরও কম আলো আসে পৃথিবীতে। এই আপাত-দীপ্তি ও আসল-দীপ্তি থেকে হিসেব করে দেখা গেছে যে ধ্রুবনক্ষত্রের দূরত্ব প্রায় দুশ আলো-বছর। এসব সিফাইডের সন্ধান পাওয়ার পর থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব বের করার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে। আয়তনে প্রকাণ্ড বড়ো বলে আকাশে এদের খুঁজে পাওয়া সহজ।

চোখ বা দূরবীন যা দিয়েই দেখি-না কেন, কোনও নক্ষত্রকেই আমরা আকাশে চলে বেড়াতে দেখি না; আসলে কিন্তু এরা প্রত্যেকেই চলছে, আমাদের কাছে থেকে কল্পনাতীত দূরে আছে বলে, গতির দরুন এদের অবস্থানের যে-পরিবর্তন ঘটে, তা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু নক্ষত্রের গতি ধরা পড়ে গেছে তার ছড়িয়ে দেওয়া আলোর বর্ণালী

পরীক্ষায়। কী করে সম্ভব হয়েছে তা একটু বুঝিয়ে বলি। বাঁশি বাজিয়ে দূর থেকে রেলগাড়ি যতই আমাদের দিকে এগিয়ে আসে তার আওয়াজও পূর্বের চেয়ে ততই চড়া হতে থাকে, কারণ গাড়ি স্থির হয়ে থাকলে বাঁশির শব্দ হাওয়াতে ঢেউ তুলে যে-মাত্রার আওয়াজ আমাদের কানে পৌঁছিয়ে দিত, গাড়ি এগিয়ে আসার দরুন সেই ঢেউগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে কানে অপেক্ষাকৃত চড়াসুরের অনুভূতি জাগায়। আবার গাড়ি যখন আমাদের পিছনে ফেলে দূরে সরে যেতে থাকে তখন তার এগিয়ে চলার গতিতে শব্দতরঙ্গগুলি বিকীর্ণ হয়ে বাঁশির আওয়াজে নিম্নসুর ধ্বনিত করে (Doppler Effect)। কোনো জ্যোতির্ময় পদার্থের আলোর ঢেউ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে; পদার্থটি স্থির থাকলে যতটা দৈর্ঘ্যের আলোর ঢেউ আমাদের চোখে এসে আঘাত করত, এগিয়ে এলে তার ঢেউগুলি ঠেসাঠেসি ভিড় করে পূর্বের চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের ঢেউয়ের অনুভূতি জন্মায়। আবার উজ্জ্বল পদার্থটি দূরে সরে যেতে থাকলে তার আলোর ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য খানিকটা বেড়ে যায়। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে আলোর মূলপ্রকৃতি খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে আলো একটা ঢেউখেলানো বেগ (Wavy pulsations)। এই ঢেউয়ের বাহন ইথর (Ether) নামে অতি সূক্ষ্ম এক পদার্থ যা সর্বব্যাপী; জলে, স্থলে, আকাশে, মহাশূন্যে, অণুপরমাণুর অভ্যন্তরে সর্বত্র আছে। দীপ্তিমান পদার্থমাত্রই তার অন্তর্নিহিত তেজে সর্বদা চঞ্চল, এই চঞ্চলতার আঘাতে ইথরে কম্পনের সৃষ্টি হয়ে সেই তেজ অতিক্রত পরিব্যাপ্ত হয় ঢেউয়ের আকারে। এই আঘাতের মাত্রার উপরেই নির্ভর করে ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য, আর এই দৈর্ঘ্যভেদে সৃষ্টি হয় রঙের ভেদ। যে-সব আলোর ঢেউ দৈর্ঘ্যে কম বর্ণালীতে তাদের স্থান হয় বেগনি রঙের দিকে, আর যারা দৈর্ঘ্যে বেশী তাদের অবস্থান লালের দিকে। এখন কোনো

নক্ষত্র যদি সোজা আমাদের পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তাহলে তার আলোর বর্ণালীর সব রেখাগুলিই বেগনি রঙের দিকে একটু সরে আসে (Violet Shift), আর নক্ষত্র যদি ক্রমাগত দূরে সরতে থাকে তাহলে ওই রেখাগুলিই সরে যায় লাল রঙের দিকে (Red Shift)। বর্ণ-রেখা কী পরিমাণ সরবে তা নির্ভর করে নক্ষত্রের গতির মাত্রার উপর, গতির মাত্রা বাড়লে বর্ণ-রেখার স্থানচ্যুতির পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কাজেই নক্ষত্রের গতির সংকেত, তার আলোর বর্ণরেখাগুলিই স্থান পরিবর্তন করে, আমাদের জানিয়ে দেয়। এই উপায়েই জানা গেছে সুদূর বিশ্বের নক্ষত্রদলের মধ্যে কেউ বা এগিয়ে আসছে আমাদের পৃথিবীর দিকে আবার কেউ বা ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে।

যে-ছায়াপথের এলাকায় আমরা আছি তার দখলে আছে কোটি কোটি নক্ষত্র ; এদের প্রত্যেকেই ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে প্রচণ্ড গতিতে ক্রমাগত ঘুরছে। যে-নক্ষত্র এই কেন্দ্রের যত কাছে রয়েছে তার ঘোরার বেগও তত বেশী। সূর্য তার গ্রহপরিবার নিয়ে সেকেণ্ডে প্রায় ১৭৫ মাইল বেগে ঘুর খাচ্ছে ; এর চেয়ে যে-সব নক্ষত্র কেন্দ্রের আরও কাছে তাদের ঘোরার বেগ বেশী বলে তারা ক্রমাগত সূর্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার এই কেন্দ্র থেকে যাদের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী তাদের ঘোরার বেগ কম, তাই তাদের পিছিয়ে পড়তে দেখছি। এদের তুলনায় সূর্য যাচ্ছে এগিয়ে। আবার যে-সব নক্ষত্রের দূরত্ব সূর্যের সমান তাদের আমরা এগোতে বা পেছোতে দেখব না, কারণ তা'রাও সূর্যের মতো প্রতি সেকেণ্ডে ১৭৫ মাইল বেগে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে ঘুর খাচ্ছে। এই অবস্থা কল্পনা করার সুবিধা হবে যদি দুটি চলন্ত ট্রেনের দৃষ্টান্ত আমরা মনে আনি। পাশাপাশি লাইনে

দুটি ট্রেন যদি সমান বেগে চলতে থাকে, তাহলে কোনো ট্রেনের যাত্রীই দেখবে না অপর ট্রেনের যাত্রী এগোচ্ছে বা পেছোচ্ছে, অর্থাৎ উভয় ট্রেনের যাত্রীদের আপেক্ষিক দূরত্বের কোনও পরিবর্তনই হবে না। ইতি-মধ্যে একটি ট্রেন যদি তার গতি কমিয়ে দেয় তাহলে যে-ট্রেন অপেক্ষাকৃত জোরে চলছে তার যাত্রীরা দেখবে অন্য ট্রেনটি ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। আবার গতি যার কমেছে তার যাত্রীরা দেখবে অন্য ট্রেনটি ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। আমাদের নক্ষত্রচক্রের মধ্যেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটছে; এর অন্তর্গত যে-সব নক্ষত্র রয়েছে সূর্যের তুলনায় তাদের কারও বা গতি বেশী কারও বা কম। বিভিন্ন নক্ষত্রের যে আপাত গতির উপলব্ধি আমাদের হচ্ছে তা এই চলতি সূর্যের গতির তুলনায়।

নক্ষত্রের আভ্যন্তরিক অবস্থা ও মহাজগতীয় মেঘ

নক্ষত্রের গঠনরীতি সম্বন্ধে ই. এ. মিল্‌নে এক নূতন মতবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক নক্ষত্রের কেন্দ্রে বস্তুপদার্থ অতি মাত্রায় ঘন, এই ঘনত্বের পরিমাণ জলের ঘনত্বের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার থেকে লক্ষগুণ বেশী; কেন্দ্র থেকে যতই নক্ষত্রের বহিরাবরণের দিকে যাওয়া যায় তার পদার্থের ঘনত্বও অতি দ্রুত কমতে কমতে উপরিতলে এসে বায়বের ঘনত্বে ঠেকে। কেন্দ্রের কাছাকাছি তার উষ্ণতাও অত্যধিক বাড়াবাড়িতে পৌঁছয়; Milne-র হিসেবে এই তাপমাত্রা প্রায় একলক্ষ কোটি ডিগ্রী। এই মত মেনে নিলে বলতে হবে যে প্রত্যেক নক্ষত্রের অভ্যন্তরে রয়েছে অতি ঘন ও অতি উষ্ণ একটি বেঁটে-নক্ষত্র। মিল্‌নের আগে সার আর্থার এডিংটনও একটি মত খাড়া

করেন; তাঁর মতে নক্ষত্রের মধ্যে বস্তুপুঞ্জের ঘনত্ব আগাগোড়া প্রায় সমান, কেন্দ্র ও উপরিতলের পদার্থের ঘনত্বে যতটুকু ভেদ বর্তমান তা ঘটে অতি অল্প পরিবর্তনের মাত্রায়, বাড়াবাড়ির মাত্রা কোথাও নেই। কেন্দ্রে উষ্ণতার পরিমাণও দুই কোটি ডিগ্রীর বেশী নয় বলে তিনি অনুমান করেছিলেন। যে-প্রচুর তেজ নক্ষত্র বাইরে ছড়িয়ে দেয় তাতে শুধু একটানা খরচ চলতে থাকলে তার তেজের ভাণ্ডার, তা সে যত বিপুলই হ'ক, অল্পদিনেই শূন্য হয়ে যাবার কথা; কিন্তু বহু শতাব্দীর অপচয়েও তার তেজের পরিমাণে বিশেষ কমতি পড়তে দেখা যায়নি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে খরচের সঙ্গে সঙ্গে তার তেজের ভাণ্ডার যেমন শূন্য হতে থাকে, কোনো উপায়ে তা আবার পূরণও হচ্ছে; এরূপ অনুমান করা হয় যে, অভ্যন্তরের প্রচণ্ড তাপে নক্ষত্রের বস্তুপদার্থের সম্পূর্ণ বিনষ্টি (annihilation) ঘটে, তার থেকেই সৃষ্টি হয় বিপুল তেজ, শূন্য ভাণ্ডারে সঞ্চয়ের কাজ চলতে থাকে। এডিংটনের মত মেনে নেবার মস্ত অসুবিধা এই যে নক্ষত্রের কেন্দ্রে উষ্ণতা দুই কোটি ডিগ্রী হ'লে তা পদার্থের বিনষ্টি ঘটিয়ে তেজ সৃষ্টি করার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রচুর। কিন্তু মিল্‌নের মত অনুসারে কেন্দ্রে যে লক্ষ কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রা ধরা হয়েছে তাতে পদার্থ থেকে তেজসৃষ্টির কাজ অনায়াসে চলতে পারে। নক্ষত্রের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে মিল্‌নে একটা অতি আশ্চর্য কথা বলেছেন—বিপুল উষ্ণতা থাকা সত্ত্বেও গোটা নক্ষত্র সম্পূর্ণরূপে বাষ্পপুঞ্জ দিয়ে গঠিত নয়, প্রচণ্ড চাপে তার কেন্দ্রপ্রদেশের বস্তুপুঞ্জ জমে গিয়ে তরল বা কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। কেন্দ্রবস্তু জমাট বেঁধেছে বলেই প্রচণ্ড আবর্তনের বেগে একটি নক্ষত্র ভেঙে জুড়ি-নক্ষত্রের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। গণিতের হিসেব থেকে স্থির হয়েছে, যদি আগাগোড়া বাষ্পপুঞ্জ দিয়ে নক্ষত্র গঠিত হ'ত, তাহলে কেবলমাত্র আবর্তনের ফলে,

তা যত প্রবলই হ'ক, সে ভেঙে দুটি আলাদা টুকরো হয়ে জুড়ি-নক্ষত্রের সৃষ্টি করতে পারত না। মিলনের মত মেনে নিলে স্বীকার করতে হবে যে নক্ষত্রের ভিতরে চলেছে এক দুর্নিবার অগ্নিকাণ্ড, অসহ্য উষ্ণতায় জমাট কেন্দ্রবস্তুর মধ্যে পদার্থ ধ্বংস হয়ে অপরিমিত তেজে তার ভাণ্ডার নিয়ত পরিপূর্ণ করে তাকে অপরিসীম দীপ্তিমান করে রেখেছে; এই তেজের সঞ্চয় থেকে তার দান আলো ও উত্তাপরূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

যে-মহাশূন্যে নক্ষত্রের দল ছড়িয়ে আছে তার আয়তন কত প্রকাণ্ড ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। নক্ষত্র ও নীহারিকার আয়তন ও সংখ্যা যতই হ'ক আকাশের বিপুল শূন্যতার সঙ্গে তার সুদূর তুলনাও চলতে পারে না, বিশ্বে বেশীর ভাগ স্থানই ফাঁকা পড়ে আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে যদি দুটিমাত্র জাহাজ ভাসতে থাকে তবে আকাশে নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব এই দুটি জাহাজের ব্যবধানের সঙ্গে খানিকটা তুলনীয় হ'তে পারে। এই যে নক্ষত্রদের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান, যাকে বস্তুকণাহীন মহাশূন্য বলে এতদিন জেনে এসেছি, তা একেবারে শূন্য নয়; আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে যে আকাশের সর্বত্রই পদার্থের অস্তিত্ব বর্তমান। কোথাও বা রয়েছে দীপ্তিমান নক্ষত্র নীহারিকা, কোথাও বা আছে বহুদূর বিস্তৃত অতি সূক্ষ্ম উজ্জ্বল মেঘ, আবার কোথাও বা কালো মেঘের ঘন আবরণ। এরা প্রত্যেকেই আকাশের নির্দিষ্ট অংশ অধিকার করে বিশেষরূপে প্রকাশমান, কিন্তু এদের বাদ দিয়েও আকাশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম এক অদৃশ্য বায়ব যার নাম দেওয়া যেতে পারে "মহাজগতীয় মেঘ" (Cosmic Cloud); অনুজ্জ্বল ও স্বচ্ছ বলে ফটোগ্রাফের প্লেটে সোজাসুজি এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে না।

কী উপায়ে এই সূক্ষ্ম বায়বের সন্ধান পাওয়া গেল সেকথাই এখন বলব। একথা বলা হয়েছে যে আলো যখন কোনো বায়বের ভিতর দিয়ে যায় তখন সেই বায়বের পরমাণুর দল তাদের আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিশেষ মাত্রার রশ্মি আলো থেকে শোষণ করে, তার ফলে সেই আলোর বর্ণালীতে ওই বিশেষ মাত্রার রশ্মির স্থানে কালোরেখার আবির্ভাব হয়। এই কালো রেখার সাহায্যে কেবলমাত্র যে বায়বের বিশিষ্ট রাসায়নিক ধর্মেরই পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, তার গতির দিক ও পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি; সূর্যের এক প্রান্তে আলো-পরখ-করা যন্ত্র নির্দেশ করলে দেখা যাবে সেখানকার আলোর বর্ণালীর (লোহার বাষ্পের) কতকগুলি কালো রেখা তাদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে বেগনি রঙের দিকে কিছুটা সরে আসে; এতে প্রমাণ হয় যে সূর্যের ঐ প্রান্ত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আবার এর বিপরীত প্রান্তের আলোর বর্ণালীতে ঠিক ওই রেখাগুলিরই সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু এবার তারা খানিকটা সরে আসে লাল রঙের দিকে; বুঝতে পারি সূর্যের এই প্রান্ত আমাদের কাছে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একই সূর্যের, একপ্রান্ত এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, আর বিপরীত প্রান্ত দূরে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ সূর্য আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু সূর্যের আলোর এই বর্ণালীতে এমন কতকগুলি কালো রেখা আছে যারা একটুও স্থান পরিবর্তন করে না; এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, যে-বায়ব এই রেখাগুলির সৃষ্টি করেছে তার স্থান আবর্তিত সৌরমণ্ডলের বাষ্পপুঞ্জে নয়, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে কোথাও এই গতিহীন বায়বের অবস্থিতি। এই স্থির-রেখাগুলি (fixed lines) পরীক্ষা করে জানা গেছে যে এরা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের শোষণ-রেখা (Absorption Lines), আর এদের অবস্থিতি আমাদের বায়ুমণ্ডলে। সূর্যের আলোর

এত জটিল ও বিস্তারিত পরীক্ষায় মহাজগতীয় মেঘের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, আমাদের বহুপরিচিত বায়ুমণ্ডলকেই আবার আবিষ্কার করা হ'ল।

কিন্তু ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে কালপুরুষমণ্ডলীর একটি নক্ষত্রে (S Orionis) এই অভিনব পরীক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করেই সর্বপ্রথম এই মেঘের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন জে. হার্টম্যান (J. Hartmann)। এই উজ্জ্বল নক্ষত্র একটি জুড়ি-নক্ষত্র, এর সঙ্গীটি এত অনুজ্জ্বল যে তার আলোর বর্ণালী দেখা যায় না। আগেই বলেছি জুড়ি-নক্ষত্রে দুটি নক্ষত্রই পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে। এক্ষেত্রে জুড়ির অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল নক্ষত্রটির বৃত্তপথে গতি স্থির করা হয়েছে তার আলোর বর্ণরেখা পরীক্ষা করে; জানা গেছে তিনদিন ধরে এই নক্ষত্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার বর্ণালীর কালো রেখাগুলি বেগনি রঙের দিকে একটু সরে যায়। এর পরের তিনদিন সে দূরে সরতে থাকে, কালো রেখাগুলিও তখন লাল রঙের দিকে সরে যায়। কিন্তু এর বর্ণালীতে ক্যালসিয়ম বাষ্পের দুটি রেখা (H and K lines) পাওয়া গেছে যারা এই ছয়দিন সময়ের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে না। কাজেই একথা নিশ্চিত যে স্থানপরিবর্তনকারী রেখাগুলি থেকে এই দুইটি নিশ্চল-রেখা (fixed lines) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এরা এই নক্ষত্রের আলোর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি তা হ'ত তাহলে নক্ষত্রের গতির প্রভাবে অন্যান্য রেখার ন্যায় এরাও সরে যেত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও ক্যালসিয়ম বাষ্পের খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি; তাহ'লে দেখা যাচ্ছে এই বাষ্প না রয়েছে নক্ষত্রে, না পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে, কাজেই এদের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে এর অবস্থিতি এরূপ অনুমান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। নক্ষত্রের বর্ণালীতে সোডিয়ম বাষ্পেরও একটি নিশ্চল-রেখার সন্ধান পাওয়া গেছে। দূরবর্তী আকাশের অনেক নক্ষত্রের

আলোর বর্ণালীতে সোডিয়ম ও ক্যালসিয়ম বাষ্পের এই স্থির-রেখাগুলির খোঁজ মিলেছে। এই পরীক্ষা থেকেই হার্টম্যান সিদ্ধান্ত করেন যে নক্ষত্র ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী আকাশে সোডিয়ম ও ক্যালসিয়ম বাষ্পের মেঘ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

হার্টম্যানের সিদ্ধান্ত অনেকদিন পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহণ-যোগ্য বলে অনুমোদন করেননি, এর বিরুদ্ধে তাঁরা এই নজির দেখিয়েছিলেন যে অতিমাত্রায় উষ্ণ নক্ষত্র ছাড়া (O and B-type) অন্য নক্ষত্রে এসব নিশ্চল-রেখার সন্ধান পাওয়া যায় না; যদি মহাজগতীয় বাষ্প সর্বত্রই থাকত তাহলে প্রত্যেক শ্রেণীর নক্ষত্রের আলোতেই এসব রেখার খোঁজ মিলত। যে-যুক্তির বলে হার্টম্যানের সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়নি তার মধ্যেও খুব দুর্বলতা আছে, সেকথাই এখন একটু আলোচনা করব। মহাজগতীয় বাষ্পের ঘনত্ব এত কম যে এর সংকীর্ণ স্তরের ভিতর দিয়ে আলো এলে তা অতি অল্পই শোষিত হয়, শোষণের মাত্রা এত কম বলে এই আলোর বর্ণালীতে কালো রেখাগুলি ফুটে ওঠে না। কাজেই নিকটবর্তী নক্ষত্রের আলোতে এসব রেখার অস্তিত্ব না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আকাশের দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে যে-আলো আসে তাকে পার হয়ে আসতে হয় এই মেঘের বিস্তীর্ণ স্তর, তাই সে শোষিত হয় বেশী মাত্রায়, কালোরেখাগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এই আলোর বর্ণালীতে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে-সব নক্ষত্রের দূরত্ব হাজার আলো বছরের বেশী শুধু তাদের আলোতেই এসব রেখার সন্ধান পাওয়া যায়; দূরত্ব যাদের এত বেশী তাদের আসল উজ্জ্বলতা (Real Brightness) ও তাপমাত্রা অত্যধিক না হলে, এত দূরের পথ পেরিয়ে পৃথিবীতে আসতে তাদের আলো হ'ত অত্যন্ত ম্লান, আলো-পরখ-করা যন্ত্রে এই ম্লান আলোর কালো রেখাগুলি পরীক্ষা করা যেত না। অর্থাৎ পৃথিবীতে বসে তাদের

আলোর পরীক্ষা চলতে পারে ততটুকু আপাত-উজ্জ্বলতা (Apparent Brightness) তাদের থাকা চাই ; আসল-উজ্জ্বলতা খুব বেশী না হলে এটা সম্ভব হতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে-রেখাগুলি মহাজগতীয় মেঘের অস্তিত্বের খবর এনে দেয়, কোনো নক্ষত্রের আলোতে তাদের সন্ধান পেতে হ'লে সেই নক্ষত্রের দূরত্ব হবে কম পক্ষে হাজার আলো-বছর, আর তার তাপমাত্রা হবে অত্যধিক। কেন যে অতি মাত্রায় উষ্ণ ও দূরের নক্ষত্রেই শুধু এসব নিশ্চল কালোরেখার খোঁজ পাওয়া যায় তা এখন বোঝা গেল। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে—এই নক্ষত্র এমন শ্রেণীর হওয়া চাই যাতে তার উপাদান পদার্থে সোডিয়ম ও ক্যালসিয়ম বাষ্প না থাকে ; তার কারণ এই দুটি বাষ্পের দরুন যে-রেখাগুলি নক্ষত্রের বর্ণালীতে সাধারণত পাওয়া যায় তারা বেশ চওড়া ও গাঢ়, তাই মহাজগতীয় বাষ্পের সূক্ষ্ম শোষণ-রেখাগুলিকে তারা সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলতে পারে। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বিশেষ শ্রেণী ও বিশেষ দূরত্বমাত্রার নক্ষত্র ছাড়া সব নক্ষত্রের আলোতে মহাজগতীয় মেঘের কালো নিশ্চল-রেখাগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে না। হার্টম্যানের পর স্লিফার (Slipher), প্লাস্কেট (Plaskett) ও পিয়ার্স (Pearce) বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করে এই মেঘের অস্তিত্ব একেবারে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন।

বিশ্বে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টির মূল রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে অনেক মতবাদ উঠেছে নেমেছে। এই ওঠা-নামার আন্দোলনে যা আজও অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য বলে টিকে আছে তার নাম নীহারিকাবাদ (Nebular Hypothesis)। এই মতবাদ অনুসারে অনুমান করা হয় যে সৃষ্টিতে রূপবৈচিত্র্যের পালা শুরু হবার অনেক আগে বিশ্বের সর্বত্র ছিল একটা পরিব্যাপ্ত দীপ্তিমান বাষ্প। গরম জিনিসমাত্রই আপন তেজ ছড়িয়ে দিয়ে

ঠাণ্ডা হতে থাকে ; ফুটন্ত জল থেকে তার বাষ্প প্রথমে বাইরে বেরিয়ে আসে, তারপর তাপ ছড়িয়ে ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে সেই বাষ্প জমে হয় জলের কণা। এই পরিব্যাপ্ত জলন্ত বাষ্পও বহুযুগ ধরে ঠাণ্ডা হয়ে ছোটো ছোটো টুকরোর আকারে ভেঙে পড়েছিল ; সেই ভেঙে-পড়া টুকরোর প্রত্যেকটিই একটি নীহারিকা। নীহারিকা আবার যতই ঠাণ্ডা হয়ে ঘন হতে আরম্ভ করল ততই তার মধ্যে প্রচণ্ড এক চাপের সৃষ্টি হয়ে তাকে ঘুর খাওয়াতে লাগল। ঘোরার বেগ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নীহারিকার পদার্থপুঞ্জের ভিতর জেগে উঠল বাইরে বেরিয়ে যাবার একটি শক্তি (Centrifugal Force)। চলতি গাড়ির চাকা থেকে কাদা যেমন বাইরে ছিটকে পড়ে, এই নীহারিকার ঘূর্ণিবেগ যখন একটা বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল তখন ঠিক তেমনি করেই তার দেহ থেকে জলন্ত বাষ্পের টুকরো ছিটকে পড়ল। ছিটকে-পড়া এই টুকরোগুলি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্রের দল ; ভাঙার মুখে যে-বেগ নিয়ে নক্ষত্র বেরিয়ে এসেছিল তারই জোরে সে আজও আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীহারিকা ভেঙে নক্ষত্র সৃষ্টি হতে আজও দেখা যায়নি বটে, কিন্তু ভাঙার পূর্বে নীহারিকার যে-আকার হয় সে-আকারের অনেক নীহারিকা দুরবীনে ধরা পড়েছে, এর থেকে মাঝের ভাঙবার অবস্থাটা কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। দেশকালের যে বিরাট পরিমাপ ও পরিমাণ নিয়ে বিশ্বইতিহাস তার অণুমাত্র স্থান ও কণামাত্র সময়টুকুতে মানুষের অবস্থান, প্রকাণ্ড বিশ্বে বিপুল কালমাত্রায় যা সংঘটিত হয় তার সব কিছু প্রত্যক্ষ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব ; তাই অতিক্ষুদ্র মাপে শক্তি ও পদার্থের ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে, বুদ্ধির সাহায্যে, অতিবড়োদের মধ্যে এদের ব্যবহারের অনেক কিছুই তাকে কল্পনা করে নিতে হয়। দীপ্তিমান পরিব্যাপ্ত বাষ্প থেকে যদি নীহারিকা নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে হিসেব কষে

প্রমাণ করা যায় যে জ্যোতিষ্কদের মধ্যে এই বাষ্পের অধিকাংশ বস্তুপুঞ্জ সংহত হলেও সবটা হয় না, খানিকটা, পরিমাণে অতি অল্প হলেও, তাদের মধ্যবর্তী স্থানে থেকে যায়। শূন্য ঘরের ধূলিকণার মতো বিশ্বের সমস্ত আকাশ ছেয়ে আছে এই বাষ্পের যে-অংশ সংহত হয়নি তারই অণু-পরমাণুর দল; এরই নাম দেওয়া হয়েছে মহাজগতীয় মেঘ। আকাশ-পথে নক্ষত্রের দল ইতস্তত চলে বেড়াচ্ছে, আর তাদের মহাকর্ষের বলে নিয়ত এই মেঘের অণুপরমাণু আত্মসাৎ করে নিচ্ছে; এ যেন মহাকর্ষের বাহু প্রসারিত করে নক্ষত্রের দল মহাকাশে বস্তুকণা অপসারণের কাজ করে চলেছে। বিশ্বের বিপুল আয়তনের তুলনায় এদের সংখ্যা নিতান্তই কম, তাই এভাবে সমস্ত বিশ্বকে বস্তুকণাহীন পরমশূন্যে পরিণত করতে অন্ততপক্ষে দশহাজার লক্ষ কোটি বছর লাগবে।

আর-একটা কথা বলেই নক্ষত্রের আলোচনা শেষ করব। যে দুর্নিবার অগ্নিকাণ্ড নক্ষত্রের ভিতর চলেছে তার খানিকটা আভাস পাই তার ছড়িয়ে দেওয়া তেজ থেকে। পদার্থের ন্যায় এই তেজেরও ওজন আছে। সূর্যের দেহ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে যে-পরিমাণ তেজ নিঃসৃত হয় তার ওজন প্রায় চল্লিশ লক্ষ মন, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের ওজন চল্লিশ লক্ষ মন কমছে। আজ এই মুহূর্তে সূর্যের যা ওজন কাল ঠিক এই সময়ে তার ওজন কমে যাবে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টন। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে যে-প্রলয়কাণ্ড চলছে তারই আঘাতে পরমাণুর বিনাশ ঘটিয়ে তেজের উদ্ভব হয়; পরমাণু লোপ পায়, কিন্তু যে সুতীব্র তেজের সৃষ্টি হয় তার ওজন ঠিক পরমাণুর ওজনের সমান। নক্ষত্রের ভাণ্ডার এত বৃহৎ যে তার মধ্যে পরমাণুর প্রলয়ের উদ্দামতা বহুকাল ধরে চলতে পারে, এই অপরিমিত লোকসানেও তার রিক্ত হতে লাগে বহু কোটি বছর। যে-পরিমাণ পরমাণুর সঞ্চয় সূর্যে আছে তাতে

বর্তমান লোকসানের মাত্রা বজায় রেখে সে টিকে থাকবে ১৫ লক্ষ কোটি বছর। কিন্তু শেষ বস্তুকণা পর্যন্ত পৌঁছবার অনেক আগেই, অতিরিক্ত বস্তুক্ষয়ে, সূর্যের আয়তন ও উজ্জ্বলতা অনেক কমে যাবে; বর্তমান ক্ষয়ের তুলনায় তখন তার বস্তুলোকসানের বেগ হয়ে আসবে মন্দীভূত। যুবা বয়সে নক্ষত্রের দল, তাদের বিপুল ভাণ্ডার থেকে, তাপমাত্রার বাড়াবাড়িতে অতিরিক্ত বস্তুসম্বল ক্ষয় করে ফেলে; তাই বৃদ্ধবয়সে ভাণ্ডারে যখন টান পড়ে তখন, আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টায়, অতিমাত্রায় হিসেবী হয়ে সেই তেজ খরচ করে। এই মত মেনে নিলে বলতে হবে যে অধিকাংশ নক্ষত্রই দীর্ঘজীবী, তাদের আয়ুর পরিমাণ কোটি কোটি বছর। হিসেবে স্থির করা এই তথ্য একেবারে নির্ভুল কিনা তা বলা চলে না, তবে একথা নিশ্চিত যে আকাশে নক্ষত্রের স্থিতিকালের সঙ্গে পৃথিবীতে মানুষের আয়ুর কোনো তুলনাই চলতে পারে না।

নক্ষত্রের মধ্যে একতরফা শুধু লোকসানই ঘটে না, নূতন বস্তু গড়নে তার ভাণ্ডারে খানিকটা জমাও হয়। এই সৃষ্টিকার্যে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হয় তা নক্ষত্রকে দীপ্তিমান অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখতে পারে বহুকোটি বছর। এই বিশ্বজগতে নক্ষত্রের দল বস্তুক্ষয়ে ধ্বংসের দিকে চলেছে, না নূতন বস্তুসৃষ্টিতে গড়ে উঠবার দিকে চলেছে, না একসঙ্গে লাভ লোকসানের সমন্বয়ে একটা স্থিতির দিকে চলেছে তার মীমাংসা আজও হয়নি।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক বলিয়া বিবেচ্য। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রকাশিত পুস্তকে বিষয়বস্তুর আলোচনা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ হইতে বিস্তৃততর হইবে।

"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।"—লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ

১.	বিশ্বপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এক টাকা
২.	প্রাচীন হিন্দুস্থান : প্রমথ চৌধুরী	আট আনা
৩.	পৃথ্বীপরিচয় : প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	বারো আনা
৪.	আহার ও আহার্য : পশুপতি ভট্টাচার্য	বারো আনা
৫.	প্রাণতত্ত্ব : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এক টাকা
৬.*	বাংলাসাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী	পাঁচ সিকা